



# ৰাজ কাহিনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



সিগনেট প্রেস  
কলিকাতা

সচিত্র একত্রিত সংস্করণ  
প্রথম সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৫১  
দ্বিতীয় সংস্করণ : মাঘ ১৩৫১  
তৃতীয় সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৫৩

প্রকাশক

দিলীপকুমার ঙুপ্ত

সিগ্‌নেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

মুদ্রাকর

শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

প্রভু প্রেস

৩০ কর্নওয়ালিস ট্রাট

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

অশ্বাশ্ব ছবি

স্বর্ঘ রায়

প্রচ্ছদপট ছাপিয়েছেন

গমেন আণ্ড কোম্পানি

৯।১-এ শ্রীনাথদাস লেন

ছবি ছাপিয়েছেন

গয়া আর্ট প্রেস

৫০ সি কেশবচন্দ্র সেন ট্রাট

বাধিয়েছেন

বাসন্তী বাইওিং ওয়ার্কস

৫০ পটলডাঙা ট্রাট

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

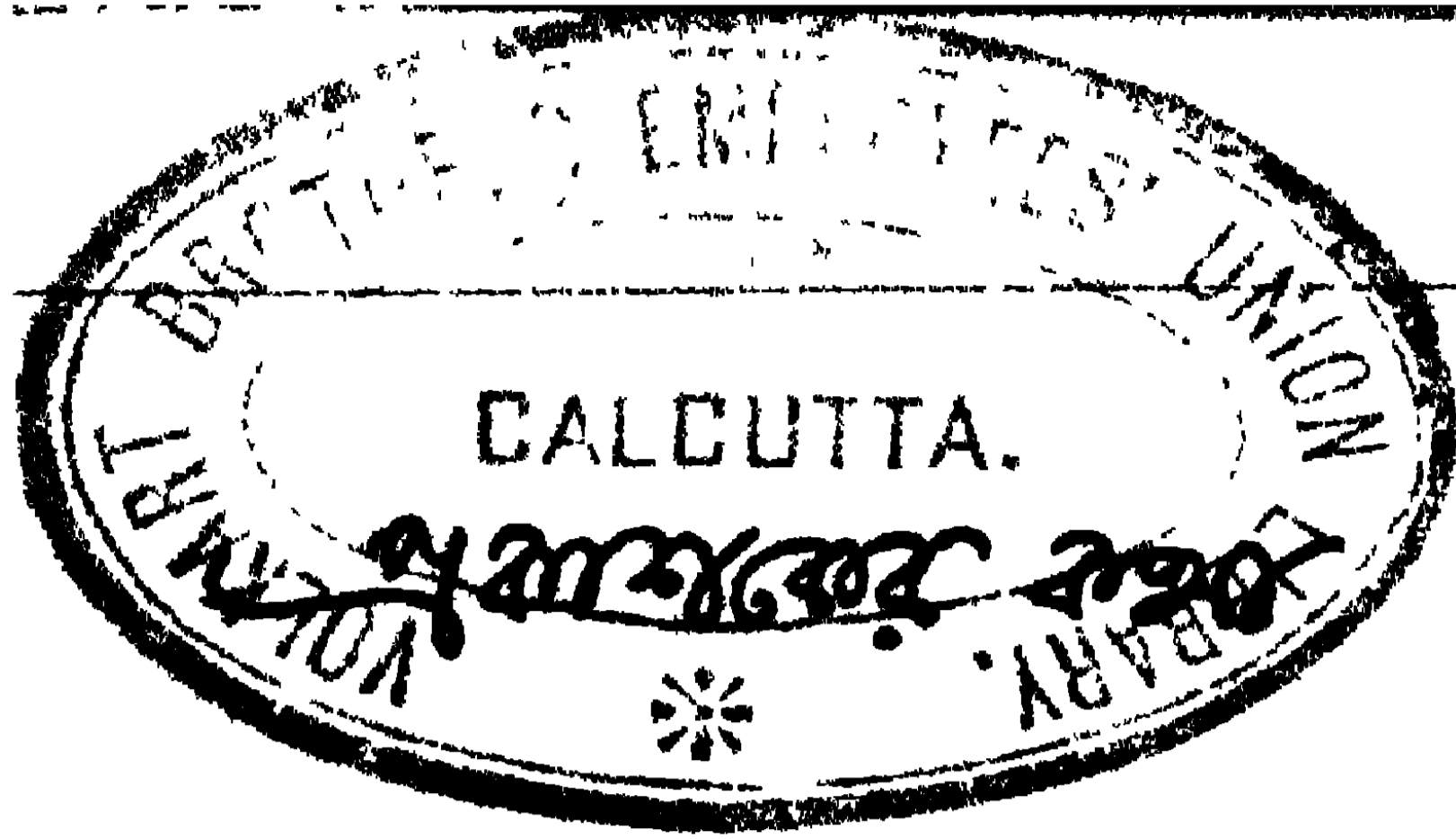
দাম ছুটাকা বারোআনা

STATE LIBRARY

ACCESSION

241

21-2-2020  
24 2.09



শিল্পের যিনি রাজা, তাঁর বিষয়ে কেউ যদি কিছু লেখে সেও তবে রাজকাহিনীই লেখে—রাজপুত্রের গল্প নয়, রাজার গল্প, রঙের রাজার, কথার রাজার। তুলিতে অতুলন—এই শুধু নয় অবন ঠাকুর, তিনি কলমেও কারুকর্মা। রেখায় আর লেখায় সমান কারিকরি। কলমের আরেক নাম যে 'অক্ষরতুলিকা' সে শুধু তাঁর হাতে এসে। তুলি দিয়ে তিনি অক্ষর আঁকেন, ছবির পর ছবি ফুটে ওঠে তাঁর কলমে। তাই ফের তাঁরই হাতে এসে তুলির আরেক নাম 'চিত্রলেখনী'।

দেশের দুই দিকপাল, অন্তহীন কালের কাছে অকলঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ। অথচ অত দূর-দুর্গম হয়েও কী আশ্চর্য ঘরের মানুষ এই অবন ঠাকুর, আমার-তোমার হৃদয়ের কাছটিতে তাঁর বাসা। আর, তাঁর মতো গল্প-বলিয়ে কে আছে শুনি ভূ-ভারতে! তাঁর গল্পের যে ভাষা সে যেন মধুমতী নদীতে ভাসমান ময়ূরপংখী। তাঁর বলার ভঙ্গিটা চলার ভঙ্গি। উড়ছে পাখি, উঠছে-পড়ছে ঢেউ, হাওয়া বইছে ঝিরিঝিরি, কখনো বা জোরে ঝাপটা দিয়ে হুলুস্থল বাধিয়ে। কিন্তু সমস্ত গতিতে রেখার সূসাম্য, ছন্দের সুরমিতি।

সেই মধুকণ্ঠ অবন ঠাকুরের গল্প। বীরপ্রসূ রাজপুতানী ও বীরপ্রসূন রাজপুতদের নিয়ে। এই "রাজকাহিনী" একাদশ সংস্করণ পর্যন্ত ছাপা হয়ে হারিয়ে গিয়েছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষায় প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদিত হয়েও সে ছিল হাতের বাইরে। যা হতে

চলেছিল প্রায় প্রব্লেস সামিল, সেই রত্নকে আমরা উদ্ধার করে এনেছি  
বিস্মরণের ধূলিতল থেকে। দুই খণ্ড একত্রিত করে, ছবি দিয়ে অলংকৃত  
করে তুলে দিচ্ছি বাঙালী পাঠকের হাতে। নিখুঁত ছবি এঁকেছেন  
সিদ্ধহস্ত সূর্য রায়, গল্পের যা মূলবস্তু তাই তাঁর ছবিতে প্রাণস্ফূর্ত  
হয়ে উঠেছে। “রাজকাহিনী” সত্যি-সত্যিই কাহিনীদের মধ্যে রাজা।





## স্মৃতি পুস্তক

শিলাদিত্য	১
গোহ	১৩
বাপ্রাদিত্য	২৫
পদ্মিনী	৪৯
হাশির	৮১
হাশিরের রাজ্যলাভ	১০১
চণ্ড	১১৩
কুস্ত	১৩৯
সংগ্রামসিংহ	১৫৫









শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময় বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিংবা বন্ধুবান্ধব ছিল না। অনন্ত আকাশে সূর্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মতো নীল প্রকাণ্ড সূর্যকুণ্ডের তীরে আদিত্য-মন্দিরে সূর্য-পুরোহিত তেজস্বী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই একাকী, বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভারই তাঁর উপর—ভৃত্য নেই, অনুচর নেই, একটি শিষ্যও নেই! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই-সন্ধ্যা সূর্য-দেবের আরতি করতেন; প্রতিদিনই সেই শীর্ণ হাতে রাক্ষস-রাজার রাজমুকুটের মতো মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন; আর মনে-মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই, তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই।

সূর্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্যদেব অস্ত গেছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ ক'রে ভীমের বুকপাটাখানার মতো প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণ-কন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল—পরনে ছিন্নবাস, কিন্তু অপূর্ব সুন্দরী! বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্যমন্দিরে আশ্রয় চায়! ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা, অথচ তার বিধবার বেশ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুমি? কি চাও?” তখন সেই ব্রাহ্মণ-বালিকা কমলকলির মতো ছোট দুইখানি হাতে জোড় ক'রে বললে—“প্রভু, আমি আশ্রয় চাই; ব্রাহ্মণ-কন্যা, গুর্জর দেশের বেদবিদ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভাগা; বিয়ের রাত্রে বিধবা

হয়েছি, সেই দোবে ছুঁতগী ব'লে সকলে মিলে আমার আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মাও নেই, আমার আশ্রয় দাও।” ব্রাহ্মণ বললেন—“আরে অনাথিনী, এখানে কোন স্থূথের আশায় আশ্রয় চাসু? আমার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আমি যে নিতাস্ত দরিদ্র, বন্ধুহীন!”

ব্রাহ্মণ মনে-মনে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগল—‘হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও।’ ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই; আবার ভাবলেন—যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্যদেবের পূজা করলেম, আজ শেষ-দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্তত করতে লাগলেন। তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ ক’রে পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে একবিন্দু সূর্যের আলো সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্য-দেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন—এই আমার সেবাদাসী! হে আমার প্রিয়ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড়হস্তে সূর্যদেবকে প্রণাম ক’রে, দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা স্মৃভাগাকে সূর্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন।

তারপরে কতদিন কেটে গেল, স্মৃভাগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাজই শিখেছেন, কেবল নীর মতো কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পারলেন না ব’লে আরতির কাজটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন স্মৃভাগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙে পড়েছে—আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়েছে! সেই দিন স্মৃভাগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে এক সের ওজনের একটি ছোট প্রদীপ নিয়ে এসে বললেন—“পিতা, আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে

সূর্যদেবের আরাতি করুন।” ব্রাহ্মণ একটু হেসে বললেন—“সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরাতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরাতি করা চাই! নতুন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নতুন দিনে নতুন প্রদীপে সূর্যদেবের আরাতি হবে।” সেইদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ স্মভাগাকে সূর্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন—যে মন্ত্রের গুণে সূর্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে-মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে সন্ধ্যার অন্ধকারে আরাতিশেষে নিভন্ত প্রদীপের মতো ব্রাহ্মণের জীবন-প্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল—সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার ক’রে অস্ত গেলেন। স্মভাগা একলা পড়লেন।

প্রথম দিনকতক স্মভাগা বুদ্ধের জগু কেঁদে-কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার ক’রে মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতকদিন মন্দিরের পাথরের দেয়াল মেজে-ঘবে পরিষ্কার ক’রে তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, ছাতি, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে স্মভাগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে একা-একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নতুন বাগানে দুটি-একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি-একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু-একটি ছোট পাখি, গুটিকতক রঙিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখি শুধু দু-একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র; কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে ডাল ভেঙে চুরমার করত। স্মভাগা কিন্তু কাকেও কিছু বলতেন না, হাসিমুখে সকল উৎপাত সহ্য করতেন। গাছের তলায় সবুজ ঘাসে নানা রঙের কাপড় প’রে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলে বেড়াত, দেখতে-

দেখতে স্মভাগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত । ক্রমে বর্ষা এসে  
 পড়ল—চারিদিকে কালো মেঘের ঘটা বিছ্যতের ছটা, আর গুরুগুরু  
 গর্জন । সেই সময় একদিন ক্ষুরের মতো পুবের হাওয়া স্মভাগার নতুন  
 বাগানে ফুলের বোটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ  
 শূণ্যপ্রায় ক'রে শনশন শব্দে চলে গেল । পাখির ঝাঁক হাওয়ার মুখে  
 উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙা ডানা ফুলের পাপড়ির মতো চারিদিকে  
 ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল । স্মভাগা তখন সেই ধারা  
 শ্রাবণে একা বসে-বসে বাপমায়ের কথা, স্বশুরশাস্ত্রীর নিষ্ঠুরতা, আর  
 বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা মনে ক'রে কাঁদতে  
 লাগলেন ; আর মনে-মনে ভাবতে লাগলেন—“হায়, এই নির্জনে সঙ্গী-  
 হীন বিদেশে কেমন ক'রে সারাজীবন একা কাটাব ।” হরিণের চোখের  
 মতো স্মভাগার কালো-কালো দুটি বড়-বড় চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল ।  
 তিনি পুবে দেখলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে, দক্ষিণে—  
 চারিদিকে অন্ধকার ; মনে পড়ল, এমনি অন্ধকারে একদিন তিনি সেই  
 মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন । আজও সেদিনের মতো অন্ধকার—সেই  
 বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির—কিন্তু হায়, কোথায়  
 আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুদিনে অনাথিনী অভাগিনী স্মভাগাকে  
 আশ্রয় দিয়েছিলেন ! স্মভাগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই  
 বিন্দু বৃষ্টির মতো অন্ধকারে ঝরে পড়ল । স্মভাগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার  
 বন্ধ ক'রে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন । তারপর কি  
 জানি কি মনে ক'রে, স্মভাগা সেই সূর্যমূর্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন ।  
 ক্রমে স্মভাগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারিদিক থেকে ঝড়ের ঝন্ঝানা,  
 মেঘের কড়মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল ! স্মভাগার মনে  
 আর কোনো শোক নেই, কোনো দুঃখ নেই । তাঁর মনের অন্ধকার যেন  
 সূর্যের তেজে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে । স্মভাগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে, বৃদ্ধ

ব্রাহ্মণের কাছে শেখা সেই সূর্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন ; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সূভাগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখির গান, বাঁশির তান, আনন্দের কোলাহল ! তারপর গুরুগুরু গভীর গর্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় ক'রে, সেই মন্দিরের পাথরের দেয়াল, লোহার দরজা, যেন আঙুনে আঙুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আঙুনের সমান জ্যোতির্ময় আলোময় সূর্যদেব দর্শন দিলেন । সে আলো, সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ হয় না । সূভাগা দুইহাতে মুখ ঢেকে বললেন—“হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জলে যায় !” সূর্যদেব বললেন—“ভয় নেই, ভয় নেই । বৎসে, বর প্রার্থনা কর ।” বলতে বলতে সূর্যদেবের আলো ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙা আভা সধবার সিঁদুরের মতো সূভাগার সিঁথি আলো ক'রে রইল । তখন সূভাগা বললেন—“প্রভু, আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমার আর না থাকতে হয় ; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক ।” সূর্যদেব বললেন—“বৎসে, দেবতার বরে মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর !” তখন সূভাগা সূর্যদেবকে প্রণাম ক'রে বললেন—“প্রভু যদি বর দিলে, তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি ! ছেলেটি তোমার মতো তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কণার মতো সুন্দরী ।” সূর্যদেব তথাস্তু ব'লে অন্তর্ধান করলেন । ধীরে ধীরে সূভাগার চোখে ঘুম এল, সূভাগা পান্নাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন । চারিদিকে ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নাবল । তখন ভোর হয়ে এসেছে, সূভাগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তাঁর সেই ভাঙা মালঞ্চ দুটি ছোট পাগি কি সুন্দর গান ধরেছে ! ক্রমে সকাল বেলায় একটুখানি সোনার আলো

সুভাগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কচি ছুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্যদেবের বর সফল হল—সুভাগা দেবতার মতো সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জন মন্দিরে জন্ম হল ব'লে, সুভাগা দুজনের নাম দিলেন, গায়েব, গায়েবী।

সুভাগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এলেন ; তখন পূবে সূর্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন। সুভাগা দেখলেন, গায়েবের মুখে সূর্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল। তিনি মনে-মনে বুঝলেন, গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশ যখন বড় হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরে কাজকর্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্ট শান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোট ছোট মেয়ে সেধে-সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে—গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে, সকল বিষয়ে বড় ; এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই ; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই ব'লে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা ব'লে কাঁধে ক'রে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব হাসি-খুশিতে সেই সকল ছোট-ছোট ছেলের কাঁধে বসে আছেন, এমন সময় একটি খুব ছোট ছেলে ব'লে উঠল—“আমি রাজার পূজারী। মন্ত্র প'ড়ে গায়েবকে রাজটীকা দেব।” তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে একটা মাটির চিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মতো

সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোট ছেলেটি তার কপালে তিলক টেনে দিয়ে বললে—“গায়েব, তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কি ? বাপের নাম কি ?” গায়েব বললেন—“আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী—মায়ের নাম সুভাগা । আমার বাপের নাম—কি ?” গায়েব জানেন না যে তিনি সূর্যদেবের বরপুত্র । নাম বলতে পারলেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো হো করে হাততালি দিতে লাগল, লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল । তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ ক’রে চড়-চাপড়ে ছোট ছেলেদের ফোলাগাল বেশি ক’রে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপতে-কাঁপতে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন । সুভাগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে কেমন ক’রে সূর্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন ; এমন সময় ঝড়ের মতো গায়েব এসে পিতলের সেই প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে টান মেরে ফেলে দিলেন । নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের-দেয়ালে লেগে ঝন্-ঝন্ শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সূর্যদেবের মূর্তি-আঁকা একখানা কালো পাথর সেই দেয়াল থেকে খসে পড়ল । সুভাগা বললেন—“আরে উন্মাদ কি করলি ? সূর্যদেবের মঙ্গল-আরতি ছারখার ক’রে দেবতার অপমান করলি ?” গায়েব বললেন—“দেবতাও বুঝিনে, সূর্যও বুঝিনে ; বল, আমি কার ছেলে ? না হলে আজ তোমার সূর্যমূর্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব ।” যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্যমূর্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভাগার মনে হল—কি জানি কি করে ! তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধ’রে বললেন—“বাছা শান্ত হ, স্থির হ আর সূর্যদেবের অপমান করিসনে ; পিতার নামে কি কাজ ? আমি তোঁর মা আছি, গায়েবী তোঁর বোন, আর তোঁর কিসের অভাব ?” গায়েব তখন কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—“তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র, পথের

ধূলো, ভিখারীর অধম ?” কথাগুলো তীরের মতো স্মৃভাগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন ; মনে মনে ভাবলেন—হায় ভগবান, কি করলে ? এ দুঃস্থ ছেলেকে কেমন ক’রে বোঝাই, কি ব’লে প্রবোধ দিই ? গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র, এ কথায় কে বিশ্বাস করবে ? স্মৃভাগার সূর্যমন্ত্রের কথা একবার মনে হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে, দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কচি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যেতে হবে—তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল । স্মৃভাগা বললেন—“বাছা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল্ আমরা অত্র দেশে চলে যাই, সূর্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ ।” গায়েব ঘাড় নাড়লেন, বিশ্বাস হয় না । তখন স্মৃভাগা বললেন—“তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর, এখনি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায়, আমাকে আর ফিরে পাবি না !” স্মৃভাগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল ! গায়েবী বললে—“ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও ?” গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ ক’রে দিলেন । স্মৃভাগা দুজনের হাত ধ’রে সূর্যমূর্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন । এই মন্দিরে একাকিনী স্মৃভাগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা ক’রে যে-মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মতো সেই সূর্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কতই ব্যথা ! সূর্যদেব দর্শন দিলেন—সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্তিতে দর্শন দিলেন । স্মৃভাগা বললেন—“প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান ?” সূর্যদেব একটিও কথা কইলেন না । দেখতে দেখতে সূর্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিণী স্মৃভাগার সুন্দর শরীর জলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল । গায়েবী কেঁদে উঠল—“মা, মা !” গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—“মা কোথা ?” সূর্যদেব কোনোই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন ।



গায়েব বুঝলেন—মা আর নেই । রাগে হুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল । গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্যমূর্তি-আঁকা সেই পাথরখানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ফেলে মারলেন । যমরাজের মহিষের মাথাটার মতো সেই কালো পাথর সূর্যদেবের মুকুটে লেগে জ্বলন্ত কয়লার মতো একদিকে ঠিকরে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্ছিত হলেন ।

অনেকক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন, তখন সূর্যদেব অন্তর্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে । গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন—“সূর্যদেব কোথায় ?” গায়েবী তখন সেই কালো পাথরখানা দেখিয়ে বললে—“ওই নাও ভাই আদিত্যশিলা । এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তার নিশ্চয় মৃত্যু । সূর্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য । তোমার বংশ সূর্যবংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্যের রথ তোমার জন্তে উঠে আসবে ! রথের নাম সপ্তাশ্বরথ । যাও ভাই, সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা-হাতে পৃথিবী জয় ক’রে এস ।” গায়েব বললেন—“তোকে কোথা রেখে যাব বোন ?” গায়েবী বললে—“ভাই, আমাকে এই মন্দিরে বন্ধ রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব । তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়িতে নিয়ে যেও ।”

গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে বন্ধ রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন । আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে “মারে ! ভাইরে !” বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল ।

সেইদিন গভীর রাত্রে যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সূর্যমন্দির ঝন্-ঝন্ শব্দে একবার কেঁপে

উঠল। তারপর আশি মণ কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্যমূর্তিকে নিয়ে আর ননীর পুতুলের মতো সুনন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নিচে চলে যেতে লাগল! গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা করলে। বৃথা চেষ্টা! গায়েবী দেয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা করলে, পাথরের দেয়ালে পা রাখা যায় না—কাচের সমান। তখন গায়েবী “ভাইরে!” ব’লে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার।

কতদিন চলে গেছে, গায়েব সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে, দেশবিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ ক’রে রাজ্যের পর রাজ্য জয় ক’রে, শেষে বল্লভী-পুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখবুদ্ধে সংহার ক’রে শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী, কাউকে বা সেনাপতি ক’রে, যত নিষ্কর্মা বুড়ো কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য, চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে ক’রে, শ্বেতপাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোনো দিকে সাড়া শব্দ নেই। পায়ে কাছ চামরধারিণী চামর-হাতে তুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ-নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর সেই ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন—তাঁর মনে হল যেন অনেক, অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে; আর যেন সেই সূর্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে—“ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে!”

শিলাদিত্য চীৎকার ক’রে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন, ভীমের বর্ম-দুখানার মতো মন্দিরের দুখানা কবাট একেবারে বন্ধ—কত কালের লতাপাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতাপাতা সরিয়ে

মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেললেন—দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাহুড় ঝটাপট ক’রে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ করলেন ; চেয়ে দেখলেন, যেখানে সূর্যদেবের মূর্তি ছিল, সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার, কালো পর্দার মতো সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন—“গায়েবী ! গায়েবী ! কোথায় গায়েবী ?” অন্ধকার থেকে উত্তর এলো—“হায় গায়েবী ! কোথা গায়েবী !” শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন ; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন— উত্তর-দিকটা শূন্য ক’রে সূর্যমূর্তির সঙ্গে-সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে ; কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ড বাসুকির ফণার মতো মাটির উপর জেগে আছে। যে-ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে-ঘরে সারাদিন খেলার পর ছুটি ভাই-বোন গুর্জরদেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মতো পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নেই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন—“গায়েবী ! গায়েবী !” তার সেই করুণ সুর, সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে-ফিরে ক্রমে দূরে থেকে দূরে, পাতালের মুখে চলে গেল। গায়েব নিঃশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন।

সেইদিন রাজ-আজ্ঞায় রাজ-কর্মকারেরা পুর সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগাগোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে-মন্দিরে আর অমূল্য মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল, তেমনিই রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেত পাথর আনিয়ে, সূর্যকুণ্ডের চারদিক সুন্দর ক’রে বাঁধিয়ে দিলেন। যখন কোনো বুদ্ধ উপস্থিত হত, শিলাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতেন ; তখন তাঁর জন্ম সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে বুদ্ধে গিয়েছেন,

সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী, যাকে তিনি সব চেয়ে বিশ্বাস করতেন, সব চেয়ে ভালোবাসতেন, সেই তাঁর সর্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে কেউ জানত না যে, শিলাদিত্যের জন্ম সূর্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্বরথ উঠে আসে।

সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল যবন যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক, তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে বড়যন্ত্র ক'রে, গো-রক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্যকুণ্ডের তীরে সূর্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মতো নীল জল ভেদ ক'রে দেবরথ উঠে এল না; শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বার-বার ডাকলেন, কিন্তু ছায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনই রইল। শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজ-রথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্যদেবের সঙ্গে-সঙ্গে সূর্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্মী শত্রু সোনার মন্দির চূর্ণ ক'রে বল্লভীপুর ছারখার ক'রে চলে গেল।







প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায়-ঢাকা ছোটখাট পাখির বাসাটি যেমন, গগনস্পর্শী বিক্র্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেতপাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনি সুন্দর, তেমনি মনোরম ছিল। স্নেহদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত্র-বীরকে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রাণী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ-মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে, যুদ্ধের পর শীতকালটা বিক্র্যাচলের শিখরে নির্জনে সেই শ্বেতপাথরের প্রাসাদে রাণী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রাণীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়, বিধাতা সে-সাথে বাদ সাধলেন, বিধর্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে যুদ্ধের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল— শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিক্র্যাচলের গায়ে রাজ-অস্ত্রপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে, পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নিচে, বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে, যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেয়ালের মতো সগান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে, যেন শূন্যের মাঝখানে ছোট একটি শ্বেতপাথরের বারাণ্ডা বসিয়েছিলেন। সেইখানে বসে, রাস্তার দিকে চেয়ে, তিনি প্রতিদিন একখানি রূপোর চাদরে সোনার স্ত্রোতায়, সবুজ রেশমে, সবুজ ঘোড়ায়-চড়া সূর্যের মূর্তি সোনার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন, আর মনে-মনে ভাবতেন—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখির পালকের মতো হালকা এই পাগড়িটি মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব; তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙনের গায়ে—পাতলা একখানি মেঘের মতো শাদা শ্বেতপাথরের সেই বারাণ্ডায় বসে মহারাজের মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব।

মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন, সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহুদূরে একটি বল্লভের মাথা ঝক্‌মক্‌ করে উঠত ; তারপর কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজ-দূত দূর থেকে হাতের বল্লভ মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় রাজরাণী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীরবেগে চন্দ্রাবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত ।

যে-দিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূণ্ডের উপরে সেই বারাণ্ডায় মহারাজার চিঠি হাতে করে বসে থাকতেন ।

সেই আনন্দের দিনে যখন কোনো বুড়ো জাঁঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে-যেতে, কোনো রাখাল বালক পাহাড়ের নিচে ছাগল চরাতে-চরাতে, চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক-ছড়া পান্নার চিক, কারো হাতে বা এক গাছা সোনার মল ফেলে দিতেন ।

রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার-হাজার আশীর্বাদ করতে-করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকালবেলায় কাজে যেত ; সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজ-দূত কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লভ-হাতে মহারাণী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত ।

পুষ্পবতী নিস্তরক সন্ধ্যায় পাহাড়ে-পাহাড়ে কালো ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন—কখনো বা কোনো বুড়ো জাঁঠের যেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি গুর সন্ধ্যায় হাওয়ার ভেসে আসত ! তারপর বিক্যাচলের শিখরে বিক্যাবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপার ভিতর লুকিয়ে রেখে পাটের সাড়ি পরে দেবীর পূজায় বসতেন ; আর মনে মনে বলতেন—“হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভালোয়-ভালোয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আন । ভগবতী, আমার যে ছেলে



হবে, সে যেন মহারাজেরই মতো তেজস্বী হয়, আর তাঁরই মতো যেন নিজের রাণীকে খুব ভালোবাসে।”

হায়, মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না।

পুষ্পবতী রাজারই মতো তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড় সাধ ছিল—সেই খেত-পাথরের বারাণ্ডায় বসে মহারাজার মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন—তাঁর যে বড় সাধ ছিল—নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মতো পাতলা সেই সুন্দর চাদরখানি জড়িয়ে দেবেন—সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, এ জন্মে আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যে-দিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন সেইদিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রাণী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রূপোর চাদরে ছুঁচের কাজ করছিলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্যমূর্তির নিচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র।

পুষ্পবতী যত্ন ক’রে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি, আঙুনের চেয়ে উজ্জ্বল, একগাছি সোনার তার, সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিষে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র, আর চাঁপার কলির মতো পুষ্পবতীর কচি আঙুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলুতার ছলের মতো বিঁধে গেল!

যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন, একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মতো পরিষ্কার সেই রূপোর চাদরে রাঙা এক টুকরো মণির মতো ঝক ঝক করছে। পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই একবিন্দু রক্ত ক্রমশ ক্রমশ বড় হয়ে, একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদরখানি রক্তময় ক’রে ফেললে।

সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল

চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বললেন—“মা, আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে কি সর্বনাশ ঘটল!” রাজরাণী বললেন—“আর ক’টা দিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে থাক।”

পুষ্পবতী বললেন—“না, না, না, মা!”

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশিজন রাজপুত্র বীর, আর ছোটো উটের পিঠে নীল রেশমী-মোড়া একখানি ছোট ডুলি, বড় রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া-পাহাড়ের নিচে বীরনগর পর্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুনের মতো বালি ভেঙে, উটে চড়ে বল্লভীপুরে যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই। পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন যে, শিলাদিত্য আর নেই; বিধর্মী স্নেহ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখে এক ফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সরল না; কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মতো ধূ ধূ করতে লাগল। তিনি লক্ষ-লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেললেন। তারপর উদাস-প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষী পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মতো সেই মালিয়া-পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন।

মরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রাণীর কোলে অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল। নাম রইল গোহ।

রাণী পুষ্পবতী সেইদিনই বীরনগর থেকে তাঁর ছেলেবেলায় প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে, সেই আশি জন রাজপুত্র বীরের

সম্মুখে তাঁর বড় সাধের রাজপুত্র গোহকে সঁপে দিয়ে বললেন—“প্রিয় সখী, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলাম, তুমি মায়ের মতো একে মানুষ কোরো। তোমার আর কি বলব ভাই? দেখো রাজপুত্রকে কেউ না অশ্রদ্ধ করে। আর ভাই, যখন চিতার আগুনে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই এক মুঠো ছাই কার্তিক-পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও—যেন আমাকে জন্মান্তরে আর না বিধবা হতে হয়।” বারবার ক’রে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত্র চন্দনের কাঠে চিতা জ্বালিয়ে চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল; শিলাদিত্যের মহিষী, রাজপুত্র-রানী, সন্ন্যাসিনী, সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় কাঁপ দিলেন। দেখতে দেখতে ফুলের মতো সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারদিকে রব উঠল—“জয় মহারানীর জয়! জয় সতীর জয়!” কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে, আর সেই ছাই-মুঠো এক হাতে নিয়ে, চোখের জল মুছতে-মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাতপুত্র-বীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেইদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রাবতীর রাজরানী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত্র-বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেননি। তাঁরা বলতেন—“আমাদের মহারানী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেলেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভী-পুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুত্রদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন। এই তাঁর রাজপ্রসাদ!”

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন।

কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মতো নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত করতে

চেষ্টা করতেন ; কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হত না, তিনি বনে-বনে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, কোনো দিন ভীলদের সঙ্গে ভীল-বালকের মতো, কোনো দিন বা সেই রাজপুত্র-বীরদের সঙ্গে রাজার মতো, কখনো ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে, কখনো বা জাল-ঘাড়ে বনে-বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন ।

মালিয়া-পাহাড়ের নিচে বীরনগর । সেখানে যত শিষ্ট, শাস্ত, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, সেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবারাত্রি ঝরণার ঝর্ঝর, আশ্চর্য আশ্চর্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে-বনে, ভীলরাজ মাণ্ডলিক, সাপের মতো কালো, বাঘের মতো জোরালো, সিংহের মতো তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মতো সত্যবাদী, বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন ।

গোহ একদিন সেই সকল ভীল-বালকদের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন । সেখানে বল্লম-হাতে বাঘের ছাল-পরা হাজার-হাজার ভীল-বালক, ঘোড়ায়-চড়া সেই রাজপুত্র রাজকুমারকে ঘিরে “আমাদের রাজা এসেছে রে ! রাজা এসেছে রে !” বলে, মাঝল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল । ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল । তখন খোড়ো-চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বললেন—“হা রে, কোথায় রে তোদের নতুন রাজা ?” ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে । তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বললেন—“ভালো রে ভালো, নতুন রাজার কপালে তিলক লিখে দে ।” তখন একজন ভীল-বালক নিজের আঙুল কেটে, বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে, রক্তের কোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজ-তিলক

টেনে দিলে : ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয়, এমন সাধ্য  
কারো নেই ।

গোহ সত্য-সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়োরাজার কাঠের  
রাজ-সিংহাসনের ঠিক নিচে একখানি ছোট পিড়ির উপর বসলেন । এই  
পিড়িখানি অনেকদিন শূণ্য পড়ে ছিল ; কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন  
নিঃসন্তান । তাঁর দীনহুঃখী সামান্য প্রজা, তাদের ঘর-আলো-করা কালো  
বাঘের মতো কালো ছেলে ; কিন্তু হার, রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার,  
চিরকাল শূণ্য ছিল ! সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে রক্তের তিলক  
প'রে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়ের বসলেন, তখন বুড়া মাণ্ডলিকের দুই  
চক্ষু সেই স্নানর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল !

ভীল-রাজের এক ছোট ভাই ছিলেন । দশ বৎসর আগে একদিন কি-  
জানি-কি-নিয়ে দুই ভাইয়ে খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে বিচ্ছেদ,  
দেখাশোনা পর্যন্ত বন্ধ ছিল । গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের  
ছোট ভাই হিমালয় পর্বত থেকে ভীল-রাজত্ব হঠাৎ ফিরে এলেন, এসে  
দেখলেন, রাজপুত্রের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে । রাগে তাঁর  
সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বললেন—  
“এ রে ভাইয়া ! বুড়া হয়ে তুই কি পাগল হয়েছিসু ? বাপের রাজ্য  
ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হলনা, তোর পরে আমি রাজা ; রাজপুত্রের  
ছেলেকে পিঁড়ের বসালি কি ব'লে !” মাণ্ডলিক বললেন—“ভাইজি, ঠাণ্ডা  
হ ।” ভাই-রাজ বললেন—“ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব ।”  
এই ব'লে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে-ফুলতে রাজসভা থেকে  
বেরিয়ে গেলেন । মাণ্ডলিক বললেন—“দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু  
হলি ।” তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে ব'সে গোহকে নিজের কোলে  
তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল-সর্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে  
শপথ করালেন, যেন সেইদিন থেকে সমস্ত ভীল-সর্দার বিপদে-আপদে,

সুখে দুঃখে গোহকে রক্ষা করে—গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয় ।  
তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল । অনেক আমোদ-আহ্লাদ ক'রে গোহ  
বীরনগরে ফিরে গেলেন ।

সেইদিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক গোহের কাছে চুপি  
চুপি গিয়ে বললেন—“গোহ, আমি তোকে ছেলের মতো ভালোবাসি,  
তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের  
হাতে তোর শত্রুকে মেরে আসব ।” গোহ কোমর থেকে নিজের নাম-  
লেখা ধারালো ছুরি খুলে দিলেন ।

ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন ! পাহাড়ের গায়ে তখন  
জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে, দূরে-দূরে ছ-একটা বাঘের গর্জন  
শোনা যাচ্ছে । মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাতছপূরে ভাই-রাজার  
দরজায় ঘা দিলেন—কারো সাড়াশব্দ নেই ! ভীলরাজ ধীরে-ধীরে  
ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলেন ; দেখলেন, তার ছোট ভাই সামান্য  
ভীলের মতো মাটির উপরে এক-হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন ।

ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল ; তিনি কালো-পাথরের  
পুতুলটির মতো ছোট ভাইয়ের স্নানর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে  
দেখে আর চোখের জল রাখতে পারলেন না । মনে ভাবলেন আমি  
কি নিষ্ঠুর ! হায়, ছোট ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু  
ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি !

মাণ্ডলিক কুড়ি বৎসরের সেই ভীল-রাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে  
ডাকলেন—“ভাইয়া !” একবার ডাকলেন, দুবার ডাকলেন, তারপর মুখের  
কাছ থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন—“ভাইয়া !”  
—কোনোই উত্তর পেলেন না । তখন বুড়ো রাজা ছোট ভাইয়ের মুখের  
কাছে মুখ রেখে তার কৌকড়া-কৌকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন  
—“ভাইয়া, রাগ করেছিস্ ? ভাইয়া, আমার সঙ্গে কথা কইবিনে

ভাইয়া ? আমি তোমার জন্তে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব ; তুই উঠে বোস, কথা ক ! ওরে ভাই, কেন তুই এই দশ বছর আমার ছেড়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি ! কেন আমার কাছে-কাছে চোখে-চোখে রইলিনে ভাই ? আমি সাধ ক'রে কি রাজপুত্রের ছেলেকে ভালোবেসেছি ? তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না ; সে সময় গোহ যে আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল । ভাই ওঠ, আমি তোমার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু ব'লে মারতে এসেছি, এই নে এই ছুরিখানা—আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক ।”

মাণ্ডলিক ভাইয়ের হাতে ছুরিখানা জোর ক'রে গুঁজে দিলেন । ধারাল ছুরি ভাই-রাজের মুঠো থেকে খসে পড়লো—বুড়ো রাজা চমকে উঠলেন ! ছোট ভাইয়ের গা-টা যেন বড়ই ঠাণ্ডা বোধ হল ! কান পেতে শুনলেন, নিঃশ্বাসের শব্দ নেই ! তিনি “ভাইয়া ! ভাইয়া !” ব'লে চীৎকার ক'রে উঠলেন ।

তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা-ভাইকে ছেড়ে রাজসিংহাসনে গোহের উপরে গিয়ে পড়ল । গোহ যদি না থাকত, তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোট ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন ; তবে কি আজ ভীল-রাজকুমার রাজ্য-হারা হয়ে রাগে-দুঃখে বুক-ফেটে মারা পড়ত ? মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোট ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন ; কিন্তু হায়, খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায়, তেমনি সেই ভীল বালকের স্নান্দর শরীর শূন্য ক'রে প্রাণপাখি অনেকক্ষণ উড়ে গেছে ।

মাণ্ডলিক আর সে ঘরে ব'সে থাকতে পারলেন না, ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাইরে দাঁড়ালেন । তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—“গোহ রে, তুই কি করলি ? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে-ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি ; গোহ, তুই কি শেষে আমার শত্রু

হলি ?” হঠাৎ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে ছুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি ক’রে চ’লে গেল। একজন ব’লে গেল—“আহা কি সুন্দর রাজা দেখেচিস্ ভাই !” আর একজন বললে—“নতুন রাজা যখন আমার হাতে ধরে নাচতে লেগেছিল, তখন তার মুখখানা যেন টাঁদপারা দেখলুম।” মাণ্ডলিক নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন—হায়, এরি মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মতো ছেড়ে ফেলেছে ! ভীল-রাজের মনে হল যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নেই।

তিনি শূণ্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড টাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন ; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত্র ভীল-রাজের সামনে দিয়ে চলে গেল। একজন বললে—“ভাই, রাজকুমার আজ শুভদিনে ভীল-রাজত্বের রাজসিংহাসনে না ব’সে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে ব’সে রইলেন কেন ?” অপরজন বললে—“গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন বুড়ো রাজা বেঁচে থাকবেন ততদিন তিনি যুবরাজের মতো তাঁর পায়ে কাছ বসবেন।” মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল ; তিনি হাসিমুখে মনে-মনে বললেন—“ধন্য গোহ ! ধন্য তার ভালো-বাসা !” হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোট ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে ! বুক যেন তাঁর ফেটে গেল ; তিনি “ভাই রে !” ব’লে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন। পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি, শিকারী কুকুরের দাঁতের মতো ভীলরাজের বুক সজোরে বিঁধে গেল—পাহাড়ে-পাহাড়ে শেয়ালের পাল চীৎকার ক’রে উঠল—হায় হায়, হায় হায় হায়, হায় হায় হায় !

পরদিন সকালে একজন রাজপুত্র পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে-যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন—ভীল-রাজের রক্তমাখা দেহ, বুক মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা ! রাজপুত্র সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে



বললেন—“গহরাজ, করেছ কি ! আশ্রয়দাতা চিরবিখ্যাসী ভীল-রাজকে খুন করেছ ?” গোহ তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুত্রের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন । তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে, ছুই হাতে চক্ষের জল মুছে, ভাই-রাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে, সূৰ্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীল-রাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন ।









তুষের আগুন যেমন প্রথমে ঝিকি-ঝিকি, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে-ক্রমে, অল্পে-অল্পে বাড়তে-বাড়তে একদিন দাউ-দাউ ক'রে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোনো রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত ক'রে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন! যখন কোনো রাজকুমার, কোনো-একদিন শখ ক'রে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিলে তামাসা দেখতেন তখন তাদের মনে পড়ত—এক বছর—, ছুঁভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানের গোলা, আশ্রয়হীন দীনহুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্তে সারা-বৎসর খুলে রেখেছিলেন! ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক ব'লে সেনাপতিদের মধ্য একটির পর একটি হাতির পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত—হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলের আগে চলতেন!

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল-প্রজাদের সরল প্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজতন্ত্রিতে পরিপূর্ণ ছিল! কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, ক্ষেত উজাড় ক'রে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না; তিনি যখন হাজার-হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর

মতো রাজপুত্রের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন ; যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচার না হলে তাঁর ঘুম হত না। শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আশ্রয়—বনে-বনে পশু শিকার—যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন ক’রে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জারি ক’রে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা-মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনোদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত্র ! দলের পর দল, বড়-বড় ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র ! সামান্য ভীলের একটি ছোট ছেলের পর্যন্ত যাবার ছকুম নেই ! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতর চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে, আজ এমন শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে—এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন ; বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অল্পদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে উঠে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে-ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত—শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া-হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত ; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চীৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিংবা হরিণের খুরের খুটখাট শোনা গেল না—মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে

আছে ! রাগে নাগাদিত্যের চুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন—“ঘোড়া ফেরাও। অসম্ভব ভীল-প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অশু পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল, আজ গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে পশুর সমান ভীলের দল শিকার করিগে।”

মহারাজার রাজহস্তী গুঁড় হুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল—তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জলে উঠল, তার চারিদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্রের ছুঁশো বল্লম সকালের আলোয় ঝকঝক করতে লাগল ! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন—“চালাও !” তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের গুঁড়ি পথে রাজহস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল ! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল—বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শন্থ শন্থ শব্দে বেরিয়ে গেল ! অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন ! তারপর চারিদিক থেকে হাজার হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুত্রের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে ; একজনও রাজপুত্র বেঁচে রইল না ; কেবল সোনার সাজপরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ি ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মতো রাজবাড়ির দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেঁলার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-একবার যে-পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে দেখছিলেন। এক সময়ে

হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল ; তারপর রাণী দেখলেন, সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেঁলার দিকে ছুটে আসতে লাগল—পিছনে তার শত শত ভীল—কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর-ধনুক ! মহারাণী দেখলেন, কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে ; তারপর দেখলেন, আগুনের মতো একটা তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর ঝাঁকি ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে ; রাজার ঘোড়া কেঁলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপর ধড়ফড় করতে লাগল । ঠিক সেই সময় মহারাণীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শন্থশন্থ-শব্দে কেঁলার ছাদের উপর এসে পড়ল । রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্নাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন । চারিদিকে অস্ত্রের ঝন্ঝনি আর যুদ্ধের চীৎকার উঠল—সূর্যদেব মালিয়া-পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন ।

সে রাত্রি কি ভয়ানক রাত্রি ! সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল তার মাঝে গুটিকতক রাজপুত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন ; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষী পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্নাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন : তিনি কতবার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন—কারো সাড়া-শব্দ নেই ! মহারাজের খবর জানবার জন্তে তিনি কতবার কত প্রহরীকে চীৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত মহারাণীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না ! রাণী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্নাকে ছোট একখানি উটের কবলে ঢেকে নিয়ে অন্তর-মহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন—





রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার ; প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদস্তুর কাজ করা বড় বড় দরজা খোলা—হাঁ-হাঁ করছে ; অত-বড় রাজপুরীতে যেন জনমানব নেই !

মহারানী অবাক হয়ে এক-হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর-হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল ; চামড়ার জুতো-পরা রাজপুত্র-বীরের মচমচ পায়ের শব্দ নয় ; রূপোর ঝাঁকি-পরা রাজদাসীর ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয় ; কাঠের খড়ম-পরা পঁচাত্তর বৎসরের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয়—এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাসু, খিটখিট পায়ের শব্দ ! মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে দেখতে অশুরের মতো একজন ভীল-সর্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল ! মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুই ? কি চাসু ?” ভীল-সর্দার বাঘের মতো গর্জন করে বললে—“জানিসনে আমি কে ? আমি সেই দুঃখী ভীল, যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি শুখের দিন ! এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েচি, আজ এই হাতে তার ছেলে শুদ্ধ মহারানীকে দাসীর মতো বেঁধে নিয়ে যাব।” মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। “ভগবান রক্ষা কর !”—বলে তিনি সেই নিরেট সোনার বড় বড় চাবির গোছা সজোরে ভীল-সর্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন। ছুরন্ত ভীল “মা রে !” বলে চীৎকার করে ঘুরে পড়ল ; মহারানী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন—তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্ত হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

রানী পথ চলতে লাগলেন—পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল—তবু রানী পথ চললেন।

কত দূর ! কত দূর !—পাহাড়ের পথ কত দূর ? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই ! রাণী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই ! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে-পাশে বীরনগরের দু-একটি ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল । পাহাড়ী হাওয়া বরফের মতো ঠাণ্ডা পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন । আট-পুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন ; আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লাট-রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুনে ঝাঁপ দিলেন ।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেই দিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোট ছোট দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে । এদেরই পূর্বপুরুষ সব-প্রথমে নিজের আঙুল কেটে রাজপুত্র গোহের কপালে রক্তের রাজ-তিলক টেনে দিয়েছিল—আজ রাজপুত্র রাজ্যের সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেল ; বিদ্রোহী ভীলেরা তাদের ঘর-ছয়োর জালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে । রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন ! কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা ; সেখানেও ভয় ছিল—কোন দিন কোন ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে ! ব্রাহ্মণ যে মহারাণীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন ! তিনি একেবারে ভীল-রাজত্ব ছেড়ে তাদের ক'টিকে নিয়ে নগেশ্বরনগরে চলে গেলেন । একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকুট পাহাড়, আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেশ্বর-

নগর, কাছাকাছি শোলাকি-বংশের একজন রাজপুত্র রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগরেনগরে ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা-ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই ছুটি ভাই—ভীল বালিয় আর দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গরু চরিয়ে রাখাল-বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজার ছেলে; কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন—তাঁর মনে বড় ভয় ছিল, পাছে কোনো ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড় হয়ে উঠলেন; যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহার মতো শক্ত হয়ে উঠল; যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক-হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র ব'লে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল, তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিত হলেন। তিনি তখন বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া-পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল-বিদ্রোহের গল্প, সেই রাণী পুষ্পবতী, মহারাজ শিলাদিত্য, রাজকুমার গোহ, তাঁর প্রিয়বন্ধু মাগুলিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পার চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারা-রাত্রি কখনো সূর্যের রথ, কখনো পাহাড়ের ভীলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন; মনে ভাবতেন—আমিও কবে হয়তো রাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন নতুন ঘাসের উপর গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা

যুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, রাজপুত্রদের বড় আনন্দের দিন ; সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোট ভাই-বোনকে কোলে ক'রে, কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে, একজন ভামাশা দেখতে, অল্প জন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্রনগরের রাজপুত্র-রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন ; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই—ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে—“ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি ?” বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন—“না যাব না।” হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব ? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনিদিদির সঙ্গে-সঙ্গে হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি-মাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া-শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝিঁর ঝিনি ঝিনি, পাতার ঝুরু-ঝুরু, সেই সময়ে বাপ্পার বড়ই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনিদিদির মুখে শোনা ভীল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান, ছোট একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ার মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিম দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো-কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে, সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাঁদের যেন বাড়ি ছিল ; সেই বাড়ির ছাদে তাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন ; সে বাড়ি কি সুন্দর ! সে চাঁদের কি চমৎকার

আলো ! যারের কেমন হাসিমুখ ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণ-ছানা চরে বেড়াত ; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত ; পাছাড়ের গায়ে কুলের গোছা ফুটে থাকত—তাদের কি সুন্দর রঙ, কি সুন্দর খেলা ! বাপ্পা সজল নরনে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন—বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল ।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কি-বংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন । রাজকুমারী বললেন—“শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে !” সখীরা বললে—“আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপাগাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলনো-খেলা খেলি আয় !” কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নেই যে ! সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জন, সেই দূরে বনে রাখাল-রাজের মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগযুগান্তরের আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো ! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে ? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন । আবার সেই বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের শ্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল ! রাজকুমারী তখন হীরে-জড়ানো হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বললেন—“যা ভাই, এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয় ।” রাজকুমারীর সখী সেই বালা-হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে—“এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার ?” হাসতে-হাসতে বাপ্পা বললেন—“পারি, যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করেন ।”

সেইদিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে নিয়ে রাজকুমার হাত

ধরে বসলেন । চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে ঘিরে  
ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—“আজ কি আনন্দ ! আজ কি  
আনন্দ !”

খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল ; রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে ক’রে  
রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন ; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে-প্রফুল্ল চাঁপার তলায়  
বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আজ  
কি আনন্দ ! আজ কি আনন্দ !

হঠাৎ একটুখানি পূবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ  
ছড়িয়ে ছ-ছ শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল । সেই সঙ্গে বড়-বড় ছুটি বৃষ্টির  
ফোঁটা টুপটাপ ক’রে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল ।  
বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন—পশ্চিমদিক থেকে একখানা  
কালো মেঘ ক্রমশ পূবদিকে এগিয়ে চলেছে—মাঝে মাঝে গুরুগুরু গর্জন  
আর ঝিকিঝিকি বিদ্যুৎ হানছে ! বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন ; মনে  
পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে । দুধের মতো শাদা তাঁর ধবলী গাই বনের  
মাঝে ছাড়া আছে । তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী  
গাইটির সন্ধানে চললেন । তখন চারিদিক অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-  
গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝকঝক করছে, আর  
জায়গায়-জায়গায় ভিজ়ে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে । বাপ্পা  
সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন । হঠাৎ  
এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন—এক  
ভেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন ; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর  
মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেই শাদা গাইয়ের  
গাঢ় দুধ স্তম্ভের মতো একটি খেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-  
আপনি ঝরে পড়ছে । বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির ছুটি চোখ সকাল-বেলার পদ্মের পাপড়ির মতো

ধীরে ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম ক'রে এক অঞ্জলি ছুখের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বললেন—“শোন বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমার আশীর্বাদ করছি—তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও। তোমার ধবলীর ছুখের ধারার আজ আমি বড়ই তুষ্ট হয়েছি! আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষদিনে তোমার আর কি দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর—এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় ক'রে দেয়—এই ছুটি তুমি লও। আর, বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই খেতপাথরের মূর্তিটি সঙ্গে রেখো, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল— একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।” তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতে জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তার পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধু-ধু করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চললেন—মেঘের গুরু-গুরু, দেবতার হুন্দুভির মতো, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল!

তখন ভোর হয়েছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন।

কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রনগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমার খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ে সঙ্কল্প নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন, আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধান ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে

উঠল, ভাবনার-ভাবনার সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্তে প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন—“পিতা, আমার বিদায় দাও। আমি তো এখন বড় হয়েছি আমার জন্তে তোমরা কেন বিপদে পড় ?” ব্রাহ্মণ বললেন—“বৎস, তুমি জাননা তুমি কে ; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন ; আমি আজ এই অল্প-বয়সে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব ?” বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন—“পিতা, বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।” ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন—“যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে, রাজারই মতো ধনুঃশর হাতে পেয়েছ ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি—পৃথিবীর রাজা হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন ! যাও বৎস, সুখে থাক !”

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলুনিদিদির কাছে বিদায় হতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীলুনিদিদি বললেন—“বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুটি ভাই—বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন-কেমন করে যে !” তারপর তিন জনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলুনিদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়-বড় পাথরের ধামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো ক’রে উড়ে বেড়াচ্ছে ; কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে ;



কোথাও বাঘের গর্জন, কোথাও বা পাখির গান ; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আর-জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার ! বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে-দেখতে, কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া-হাতে নির্ভয়ে চললেন ।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল , রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন, তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন । তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারে মৌর্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন । সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে । হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলাগুলি, চাল-ডাল, তাম্বু কানাত ; গরুর-গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র, খাবার-দাবার ; বড়-বড় জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে । রাস্তায়-রাস্তায় রাজপুত্র সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে । চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে সন্ধানে ফিরছে । মহারাজা মান নিজে সামন্ত-রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন—চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে ।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড় বড় পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনো দেখেননি । নগরজনগরে বাড়ি ছিল বটে, কিন্তু তার মাটির দেয়াল । সেখানেও মন্দির ছিল, কিন্তু সে কত ছোট ! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার এক-পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়-বড় হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ ক'রে রইল । সেই সময়ে রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন ; শাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মাথায় রাজচ্ত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর-পাখার চামর ঢোলাচ্ছে ! বাপ্পা ভাবলেন—রাজার সঙ্গে দেখা

করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুমি ? কি চাও ?” বাপ্পা বললেন—“আমি রাজপুত্র রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই।” এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে ! চারিদিকে বড়-বড় সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন—এ কোনো ভাগ্যবান ; ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান-যুদ্ধের সময় এই বীর-পুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মান-রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্তে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন—“মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্তে ঘোড়া আনিয়ে দিন !” তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন—সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল ; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—“হাঁ বীর বটে ! যেমন চেহারা, তেমনি শরীর !” চারিদিকে ধনু ধনু পড়ে গেল ; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাঁকে আদর-অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—“মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্ত প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের

ভালোবাসতে ব'লে, আমাদের বিশ্বাস করতে ব'লে; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কাজ কি? বাপ্পাকেই এই মুসলমান-যুদ্ধে সেনাপতি কর; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন ক'রে যুদ্ধ করেন, দেখা যাক!” মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নির্ভুর কথা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় সেই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পোনেরো বৎসরের বীর-বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান; তবে তাই হোক!” রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর ধীরে-ধীরে বললেন—“তবে তাই হোক!” তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিতপ্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অস্ত্রপূরে চলে গেলেন; আর-একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পোনেরো বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনই সাহস পাবে না—সভার মাঝে অপমান হবে; কিন্তু যখন সেই বীর-বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিশ্বাসের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা—যাকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী ব'লে ঘৃণা করেছেন—পোনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা—যুদ্ধ জয় ক'রে কোটি-কোটি রাজপুত্র-প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত

রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন ! সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কি আনন্দ, কি উৎসাহ !

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা ক'রে যে-দিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেইদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন । মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না ; সর্দারেরা দূতের মুখে ব'লে পাঠালেন—“আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, এক বৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে ।”

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র, কত ভয়ঙ্কর পরামর্শে কেটে গেল ! এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারদের ছুঁই পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন । রাজা মান যখন শুনলেন, বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন ; যখন শুনলেন যে-বাপ্পাকে তিনি পথের ধূলা থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভেবেছিলেন—হায় রে ! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজচ্ক্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর ছুঁই চক্ষে ঝর-ঝর ক'রে জল পড়তে লাগল ।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন ; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন ।

ষোল বৎসরে বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে ক'রে হিন্দুমুকুট, হিন্দু-সূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন । বালিয় ও দেব, ছুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজ-তিলক টেনে দিয়ে

ছুথানা গ্রাম বখশিশ পেলো । বাপ্পা সে দিন নিয়ম করে দিলেন যে  
 তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই ছুই ভীলের বংশাবলীর হাতে  
 রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে । আজও সেই নিয়ম চলে আসছে ।  
 এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের  
 হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার  
 এ একটা নতুন খেয়াল ; কিন্তু মান-রাজার সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি  
 কি তবে গিহ্লাট-রাজকুমার গোহের বংশীয় ?—সূর্যবংশেই তো ভীলের  
 হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি ! মহারাজ বাপ্পা, নাগাদিত্যের  
 মহিষী চিতোর-রাজকুমারীর ছেলে নয়তো ? রাজা মান, বাপ্পার মায়ের  
 ভাই, মামা নয়তো ? ছি, ছি ! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন—চোরের মতো  
 মামার সিংহাসন আপনি নিলেন ? এমন নির্ধুর রাজার রাজত্বে ঠাকাও  
 যে মহাপাপ ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভার মুখো হলেন না—একে একে  
 চিতোর ছেড়ে অত্র দেশে চলে গেলেন ! হায়, তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা  
 কত নির্দোষ ; বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা ! তিনি  
 তাঁর পালক পিতা, সেই বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা  
 গোহ, গায়েব-গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না যে,  
 যার নির্ধুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই  
 মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা ; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ  
 রাজকুমার গোহ, যাকে রাণী পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে  
 দিয়ে চিতার আঙুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন । বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনো  
 সামান্ত রাজ্যের রাজপুত্র ।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্ঠাকে বিয়ে ক'রে ফিরে  
 আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন ।  
 চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি  
 প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রতিদিন ছুই সন্ধ্যা পূজা করতেন ।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিতরে বাণমাতাকে প্রণাম ক'রে ওঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড় হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু স্মৃত্যে বাধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল— অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরানো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন এ কি ! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলাম ! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে ! বাপ্পা প্রফুল্ল-মুখে সেই তামার কবচ মহারাণীর হাতে এনে দিয়ে বললেন—“পড় তো শুনি।” বাপ্পা নিজেকে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারাণী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে—“বাস-স্থান ত্রিকূট পর্বত নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য।” বাপ্পা হাসি-মুখে রাণীর কাঁধে হাত রেখে বললেন—“এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি ! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে বুলন-পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে ! আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে-চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে ! আমি যদি বলতে পারতাম যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের চেউকে ‘ত্রিকূট’ বলে, যদি বলতে পারতাম সেই ছোট শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতাম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতেম, যেখানে বুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলাম, সেটি পরাশর-অরণ্য, তবে কোনো গোলই হত না ; হায় হায় ! জন্মাবধি লেখা-পড়া না শিখে এই ফল ! এতকাল পরে কি আর

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাবো ? পড় তো  
শুনি আর কি লেখা আছে ।” রাণী কবচের আর-এক পিঠ উল্টে পড়তে  
লাগলেন—জন্মস্থান মালিয়া-পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোর-  
কুমারী, নাম বাপ্পা ।”

মহারাণীর বড় বড় চোখ মহাবিশ্বয়ে আরও বড় হয়ে উঠল—তিনি  
তামার সেই কবচ-হাতে বাপ্পার পায়ের তলায়, ফুলের বিছানার মতো  
সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন ; আর গজদন্তের পালঙ্কের  
উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড় একখানা  
লালের আঙটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায় হায় ! কি পাপ  
করেছি ! এই হাতে পিতৃহত্যা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহত্যা  
হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি ! “মহারাণী ! আমি মহাপাপী আমি  
চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই । এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ  
আর আত্মীয়-বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল ।”

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেইদিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ  
হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন । তাঁর সমস্ত  
রাগ মালিয়া-পাহাড়ে ভীল-রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল । বাপ্পা মালিয়া-  
পাহাড় জয় ক’রে ভীল-রাজত্ব ছারখার ক’রে চলে গেলেন । তারপর,  
দেশ-বিদেশ—কাশ্মীর, কাবুল, ইম্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয়  
করলেন । বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল ; মালিয়া-পাহাড় জয় ক’রে  
পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর-  
সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়-বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল ; কিন্তু  
তবু মনের শাস্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন ? বাপ্পা যখন সমস্ত  
দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তক  
যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত,  
তখন বাপ্পার সেই বুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের বুলনার শোলাঙ্কি-

রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত ; যখন কোনো নতুন দেশ জয় ক'রে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালকে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিক ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত । শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটীর, মাটির দেয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাক্কি-রাজার রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তরক, অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে—সে রাজকুমারীও নেই, সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একবারে ভেঙে গেল ; তিনি শাস্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শাস্তির আশায় এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্তরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল !

এই রকম দেশে-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নী-নগরে—যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েরব গায়েরবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন । একদিন ষোল বৎসর বয়সে, রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী-নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোর ফিরে গিয়েছিলেন ; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরানো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পা আর-একবার সেই গায়নী-নগরে ফিরে এলেন । গায়নী-নগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েরব-গায়েরবীর গল্প মনে পড়ল ।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্য-পূজা ক'রে, গায়নীর রাজপ্রাসাদে খেতপাথরের শরন-মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন । হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে, কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল । তিনি



শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোর ধপ-ধপ করছে ; আকাশে আধখানি চাঁদ ; চারিদিক নিঃশব্দ। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোর দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন ! হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ার গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল ; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন—“আজ কি আনন্দ ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ !”—এ যে সেই গান ! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজ-কুমারীর ঝুলন গান !

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন ; নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে—“আজ কি আনন্দ !—” বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোর নির্জন খেত-পাথরের ছাদে, পথের ভিখারিণী, রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন—“কে তুমি ? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাকি-রাজকুমারী ? তুমি কি কখনো ঝুলন-পূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে ?” ভিখারিণী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বললে—“মহারাজ, অর্ধেক-রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কি তামাশা !” বাপ্পা বললেন—“তবে কি তুমি রাজকুমারী নও ?” ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে—“আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ, আমি মুসলমান-নবাব সেলিমের কন্যা ! একদিন পোনেরো বৎসর বয়সে, তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সে-দিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলেম—কি সুন্দর মুখ, কি প্রকাণ্ড শরীর ! আর আজ তোমায় কি দেখছি ! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই ! এমন দশা তোমার কে করলে ? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?” বাপ্পা বললেন—“সে কথা থাক, তুমি

আবার সেই গান গাও ।” ভিখারিণী গাইতে লাগল—“আজ কি আনন্দ !  
 ঝুলত ঝুলনে শ্রামর চন্দ !” বাপ্পা সমস্ত হুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের  
 দিকে চেয়ে রইলেন । গান শেষ হল ; বাপ্পা বললেন—“নবাবজাদী  
 তোমায় কি দেব বল ?” ভিখারিণী বললে—“আমার যদি রাজ্য থাকত  
 তবে তোমায় বলতেম আমার বিয়ে ক’রে তোমার বেগম কর — কিন্তু সে  
 আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে ! আমাকে তোমার বাদী  
 ক’রে কাছে-কাছে রাখ ।” বাপ্পা বললেন—“তুমি বাদী হবার যোগ্য নও,  
 আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান  
 গাইবে ।”

তার পরদিন, সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে ক’রে বাপ্পা খোরাসান  
 দেশে চলে গেলেন । সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার  
 ধারে সিরাজির পেয়লা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর  
 সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের  
 শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে !

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল । পূর্বদিকে—হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু  
 মহিষী, হিন্দু প্রজারা ; পশ্চিমে—ইরাণীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর  
 পাঠানের দল , হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে,  
 আর নোসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের মতো কবর দিতে ব্যস্ত  
 হল । শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর-এক পিঠে আল্লার দোয়া-লেখা  
 প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল, তখন  
 সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না—কেবল রাশি রাশি পদ্মফুল আর  
 গোলাপ-ফুল । চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে  
 মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন ! ইরাণী-বেগম একটি গোলাপ-  
 ফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ-জলের ফোয়ারার ধারে  
 পুতে দিলেন ; আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরাণীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ

পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিলে এক সন্ন্যাসিনী বললেন—“সখী, তোরা সেই গান গা।” চারিদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল—“আজ কি আনন্দ !”

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারী ; আর সেই রাজদেহ বাম্ভার মৃতদেহ—  
ছুজনে চিরদিন ছুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি !







सिद्धिनिधि



বাগ্নাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজ-সিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে-ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা-মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হয়ে গেছে; কিন্তু এত রাজা, এত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে কেবল জনকতক রাজার নাম আর গুটিকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুত্রের প্রাণে এখনও সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান—যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপত্যাসের সেই বোগদাদের খলিফ হারুণ-অল-রসিদের ছেলে আল মামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেকদিন বন্দী রেখেছিলেন; আশীর্বাদ করতে হলে এখনো যার নাম ক’রে রাজপুত্রেরা বলে—“খোমান তোমায় রক্ষা করুন।” আর একজন রাজা মহারাজ সমরসিংহ—যেমন বীর তেমনি ধার্মিক! তিনি যখন নাগা-সন্ন্যাসীর মতো মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজেরমালা-গলায় ভবানীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যিই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীখর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দীন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্ধেক-ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন, সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরো হাজার রাজপুত্র আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে পাশে, কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন। সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। পৃথ্বীরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু—তাঁর আঙ্গুরের মুহিবী মহারাজী পৃথার ছোট ভাই। দুইজনে বড় ভালোবাসা ছিল। তাই বুঝি এই শেষ-যুদ্ধে সমরসিংহ জন্মের মতো বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন! যখন যুদ্ধের দিনে প্রায়ের ঝড়-বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ-লক্ষ হাতি-ঘোড়া, সৈন্য-সামন্ত

ছিন্ন-ভিন্ন, ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোনো আশা নেই, প্রাণের মায়ী কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে-একে নিজের নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চললেন, তখন একমাত্র সমরসিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, রাজমুকুট, রাজসিংহাসন তুচ্ছ ক'রে প্রাণের বন্ধু পৃথীরাজের জন্তু মুসলমানের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্মান্না মহাবীর সমরসিংহ, তাঁর ষোল বছরের ছেলে কল্যাণ, আর সেই তেরো হাজার রাজপুত্রের বৃকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙা হয়ে গেল, তবে পৃথীরাজ বন্দী হলেন, তবে দিল্লীর হিন্দু-সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দিনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দিন কোথায়, কোথায় বা সে দিল্লীর রাজপুত্র ! কিন্তু যে ধর্মান্না বন্ধুর জন্তু নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করলেন, সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত্র-কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে ; এখনও রাজপুত্রনায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায়-রাস্তায় শ্রদ্ধা করে।

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশ' বৎসর কেটে গেছে। চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রানা লক্ষ্মণসিংহ আর দিল্লীতে পাঠান-বাদশা আল্লাউদ্দীন ! সেই সময় একদিন রানা লক্ষ্মণসিংহের কাকা ভীমসিংহ, সিংহল-দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে ক'রে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল ক'রে ক্রমে দিগুদিগন্তে ছড়িয়ে যায়, তেমনি কমলালয়া লক্ষ্মীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুত্রাঙ্গী পদ্মিনীর রূপের মহিমা, গুণের গরিমা দিনে-দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ করলে। কি দান দুঃখীর সামান্য কুটীর, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ—এমন সুন্দরী হেন গুণবতী কোথাও নেই।

এই আশ্চর্য সুন্দরী পদ্মিনীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের এক ধারে, শাদা-পাথরে-ঝাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে, রাজ-অস্ত্রপু্রে শীতল কোঠায়



সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময়ে একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান-বাদশা আল্লাউদ্দীন, খাসমহলের ছাদে গজদস্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে সরবতের পেয়াল-হাতে পিয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারঙ্গীর সুরে গজল গাইছিল! বাদশা হঠাৎ ব'লে উঠলেন—“কি ছাই, আরবী গজল! হিন্দুস্থানের গান গাও!” তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন ক'রে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—“হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল—তার দোসর নেই, জুড়ি নেই। সে কি ফুল? সে কি ফুল, আহা সে যে পদ্মফুল, সে যে পদ্মফুল—চারিদিকে নীল জল, মাঝে সেই পদ্মফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়েছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গ ভঙ্গে গর্জন করছিল! কার সাধ্য সে সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে! সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!” আল্লাউদ্দীন ব'লে উঠলেন—“আমি হিন্দুস্থানের বাদশা, আমি কোনো রাজারও তোয়াক্কা রাখি না, কোনো দেবতাকেও ভয় করি না। পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!” বাঁদী আবার গাইতে লাগল—“কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবান তুলল সে ফুল?—মেবারের রাজপুত-বীরের সন্তান—রানা ভীমসিংহ—নির্ভয়, সুন্দর!”

আল্লাউদ্দীন কিংখাবের মছলন্দে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল—“আজ চিতোরের অস্তুরে সে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে, তার দোসর কোথা? জগতে তার জুড়ি কই? ধন্য রানা ভীমসিংহ! জয় রাজরাণী—চিতোরের রাজ-উগানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!” আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—“চিতোরের রাজ-উগানে প্রফুল্ল পদ্মিনী!” তিনি আকাশের দিকে চেয়ে-চেয়ে ঝ'লে

উঠলেন—“বাঁদী, তুই কি স্বচক্ষে পদ্মিনীকে দেখেছিস্ ? সে কি সত্যই স্নানরী ?” বাঁদী উত্তর করলে—“জাঁহাপনা ! দিল্লী আসবার আগে আমি চিত্তোরে নাচ-গান ক’রে জীবন কাটাতেম ; পদ্মিনীর বিষের রাত্রে আমি রাণীর মহলে নেচে এসেছি ।”

আল্লাউদ্দীন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন ; কিছুক্ষণ পরে ব’লে উঠলেন—“পিয়ারী, আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি ।” পিয়ারী বেগম ব’লে উঠলেন—“শাহেনশা, আমার সাধ যায়, আকাশের চাঁদটাকে সোনার কোঁটায় পূরে রাখি ।” কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভালো লাগল না । দিল্লীর বাদশা, যাঁর মুঠোর ভিতর অর্ধেক ভারতবর্ষ, তিনি কি একজন রাজপুত-রাণীকে ধরে আনতে পারেন না ? শাহেনশা মুখ গম্ভীর ক’রে উঠে গেলেন—মনে-মনে ব’লে গেলেন, “থাকো পিয়ারী, যদি পদ্মিনীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদী হয়ে থাকতে হবে ।”

তার পরদিন লক্ষ-লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দীন চিত্তোরের মুখে চলে গেলেন । পাঠান সৈন্য যে-দিক দিয়ে গেল, সেই দিকে পথের দুই ধারে, ধানের ক্ষেত, লোকের বসতি ছারখার ক’রে যেতে লাগল ।

তখন বসন্তকাল । সমস্ত চিত্তোর-জুড়ে দিকে-দিকে আনন্দের রোল উঠেছে—“হোরি ছায় ! হোরি ছায় !” ঘরে-ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো-হো আর বাসন্তী রঙের বাহার ! সেই ফাল্গুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি-খেলার মাঝখানে, একদিন চিত্তোরে খবর পৌঁছল আল্লাউদ্দীন আসছেন—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিত্তোরের সমস্ত আনন্দ এক-নিমেষে নিবে গেল । তখন কোথায় রইল রানার রাজসভার পিঁদ-খেয়ালে হোরি-বর্ণনা, কোথা রইল রাণীদের অন্তরে ‘ফাল্গুনমে হোরি রচাও’ ব’লে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে-লাল রাস্তায় দলে-দলে হাসি-তামাশা আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের

মুহুর ! আবিরে গোলাপে লালে-লাল চিতোরের ঘরে ঘরে অস্ত্রশস্ত্রের  
 বন্‌বন্‌নার সঙ্গে আর-এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল—সে  
 খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা—তাতে বুকের রক্ত, ছুরির ঘা, কামানের  
 গর্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ ! শেষে একদিন পাঠান-বাদশার কালো  
 নিশান শকুনির মতো মেঘারের মরুভূমির উপর দেখা দিলে । ভীমসিংহ  
 হুকুম দিলেন—“কেল্লার দরজা বন্ধ কর ।” বন্‌বন্‌ শব্দে চিতোরের  
 সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল ।

আল্লাউদ্দীন ভেবেছিলেন—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব ; কিন্তু  
 এসে দেখলেন, বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে,  
 তেমনি রাজপুত্রের তলোয়ার পদ্মিনীর চারদিক দিবারাত্রি ঘিরে  
 রয়েছে । সমুদ্র পার হওয়া সহজ, কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে  
 চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব । পাঠান  
 বাদশা পাহাড়ের নিচে তাঁবু গাড়বার হুকুম দিলেন ।

সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ ক'রে রানা ভীমসিংহ  
 পদ্মিনীর কাছে এসে বললেন, “পদ্মিনী তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও ?  
 যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল, তেমনি  
 সমুদ্র ?” পদ্মিনী বললেন, “তামাশা রাখো, তোমাদের এ মরুভূমির দেশে  
 আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে ?” ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে  
 কেল্লার ছাদে উঠলেন । আকাশ অন্ধকার—চন্দ্র নেই, তারা নেই ।  
 পদ্মিনী দেখলেন, সেই অন্ধকার আকাশের নিচে আর-একখানা কালো  
 অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপার পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে ।  
 পদ্মিনী বস্তু উঠলেন, “রানা এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না ;  
 মাগো, শাদা-শাদা চেউ উঠছে দেখ !” ভীমসিংহ হেসে বললেন,  
 “পদ্মিনী, এ যে-সে সমুদ্র নয় ; ও পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল । ঐ  
 দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী ; জলের কল্লোলের মতো

ঐ শোন সৈন্তের কোলাহল ! আজ আমার মনে হচ্ছে, সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোনার পদ্মফুলের মতো তোমার ছিঁড়ে এনেছি, সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন ক'রে যে এই নিপদসাগর পার হব ভাবছি।” ভীমসিংহ আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো-পেঁচা চীৎকার ক'রে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল; তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রানা-রানীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রানার হাত ধরে নেবে গেলেন। সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল—একি অলক্ষণ ! একি অলক্ষণ !

তার পরদিন পুর্বের আকাশে ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, এমন সময় একজন রাজপুত্র সওয়ার পাঠান-শিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রূপোর কুর্সিতে বসে তশবী-দানা জপ করছিলেন; খবর হল, “রানা লক্ষণ সিংহের দূত হাজির।” বাদশা হুকুম দিলেন, “হাজির হোনে কো কহো।” রানার দূত তিনবার কুর্নিশ ক'রে বাদশার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, “রানা জানতে চান বাদশার সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্ত নিয়ে তিনি চিতোর উপস্থিত হলেন ?” আল্লাউদ্দীন উত্তর করলেন, “রানার সঙ্গে আমার কোনো শক্রতা নেই, আমি রানার খুড়ো ভীমসিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাকে পেলেই দেশে ফিরব।” দূত উত্তর করলে, “শাহেনশা, আপনি রাজপুত্র-জাতকে চেনেন না, সেই জন্তে এমন কথা বলছেন। রানার কথা ছেড়ে দিন, আমরা দুঃখী রাজপুত্র, আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোওয়াতে পারি না; আপনি রানীর আশা পরিত্যাগ করুন, বরং শাহেনশার যদি অল্প-কিছু নেবার ইচ্ছে থাকে

তবে”—আল্লাউদ্দীন দূতের কথা বাধা দিয়ে বললেন, “হিন্দুস্থানের বাদশার এক কথা—হয় পদ্মিনী, নয় যুদ্ধ!” রানার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ ক’রে বিদায় হল।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত-সর্দার একত্র হলেন কি ক’রে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়? রাজস্থানের রাজ-মুকুটের সমান চিতোর; রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর! মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড়-বড় হিন্দুরাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একেবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মতো এখনও অটল, এখনও স্বাধীন আছে! কি ক’রে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরের উদ্ধার করা যায়? অনেকক্ষণ ধ’রে অনেক পরামর্শ তর্ক-বিতর্ক চললো। শেষে রানা ভীমসিংহ উঠে বললেন, “পদ্মিনীর জন্তে যখন চিতোরের এই সর্বনাশ উপস্থিত, তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোনো দুঃখ নেই; চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে!” কথাটা ব’লে ভীমসিংহ একবার রাজসভার এক পারে, যেখানে শ্বেতপাথরের জালির পিছনে চিতোরের রাণীরা বসেছিলেন, সেইদিকে চেয়ে দেখলেন; তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বললেন, “মহারানা! কি বলেন?” লক্ষ্মণসিংহ বললেন, “যদি সমস্ত সর্দারেরতাই মত হয়, তবে তাই করা কর্তব্য।” তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত-সর্দারের প্রধান, রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “রানার বিপদে আমাদের বিপদ, রানার অপমানে আমাদের অপমান। পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নয় তিনি আমাদের রাণীও বটে। কেমন ক’রে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবীশুদ্ধ লোকে বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তারা রাণীর হয়ে লড়ে। মহারানা, আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলে যুদ্ধে যাই!” মহারানা হুকুম দিলেন, “আপাতত যুদ্ধের প্রয়োজন নেই,

সাবধানে কেয়ার দরজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দীন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুক !” সভাস্থলে ধনু ধনু পড়ে গেল। চারদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত-সর্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা একসঙ্গে ব’লে উঠল, “জয় মহারানার জয় ! জয় ভীমসিংহের জয় ! জয় পদ্মিনীর জয় !” রাজসভা ভঙ্গ হল। সেই সময় রাজসভার এক-পারে, সেই খেত-পাথরের জালির আড়াল থেকে, সোনার পদ্মফুল-লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজভক্ত সর্দারদের মাঝে এসে পড়ল। সর্দারেরা পদ্মিনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে, “রাণীর জয় !” ব’লে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

তারপর, দিন কাটতে লাগল। আল্লাউদ্দীন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেয়ার ঘিরে বসে রইলেন। বাদশার আশা ছিল যে কেয়ার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে ; কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে সম্রাটের কেটে গেল, তবু সন্ধির নাম-গন্ধ নেই। বর্ষা, শীত কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল এসে পড়েছে, পাঠান-সৈন্যেরা দিল্লীতে ফেরবার জন্তে অস্থির হতে লাগল। এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনি-চৌকে কত মজা ! সেখানে কাফিখানার কত আমোদ চলেছে ! আর তারা কিনা, কি বর্ষা, কি হিম, এই হিন্দুর মুল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে ? এখানে না পাওয়া যায় ভালো পান-তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা—যার গান শুনলে ভুলে থাকি যায়। এখানকার লোকগুলোও যেমন কাটখোটা, তাদের গানগুলোও তেমনি বেশুরো, পানগুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুরা। এ হিন্দুর মুল্লুকে আর মন ঢেকে না।

আল্লাউদ্দীন দেখলেন, নিষ্কর্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যেরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর ইচ্ছা আরো কিছুদিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন ;

যে-কোনো উপায়ে হোক সৈন্তদের স্থির রাখতে হবে। বাদশা তখন এক-একদিন এক-এক-দল সৈন্ত নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় একদিন শিকার শেষে আল্লাউদ্দীন শিবিরে ফিরে আসছেন। একদিকে সবুজ জনারের ক্ষেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মতো নীল হয়ে এসেছে, আর একদিকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেলা মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে, মাঝে সূঁড়ি পথ, সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড়-বড় হরিণ-ঘাড়ে গাইতে-গাইতে চলেছে, তার পর বড়-বড় আমীর-ওমরা কেউ হাতির পিঠে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব-শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন—এক হাতে ঘোড়ার লাগাম আর-হাতে সোনার জিঞ্জীর-বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি। বাদশা ভাবতে-ভাবতে চলেছেন—এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না ; সৈন্তেরা দিল্লী ফেরবার জন্তে ব্যস্ত, আর কতদিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায় ? যে পদ্মিনীর জন্তে এত সৈন্ত নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেম, সে পদ্মিনীকে তো একবার চোখেও দেখতে পেলেম না। বাদশা একবার বাঁ-হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন। হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল—কোনো রকমে দুখানা ডানা পাই, তবে এই বাজটার মতো চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ-মেরে নিয়ে আসি। হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে ডানার একটুখানি ঝটাপট সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কানে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল। আল্লাউদ্দীন বুঝলেন, তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোনো শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন, মাথার উপর দিয়ে দুখানি পাল্লার টুকরোর মতো এক-জোড়া শুক-শারী উড়ে চলেছে। বাদশা ঘোড়া ধামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন ; তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশায় হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার আকাশে উঠে কালো দুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে

শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একেবারে তিন শ' গজ আকাশের উপর থেকে, একটুকরো পাথরের মতো সেই ছুটি শুক-শারীর মাঝে এসে পড়ল। বাদশা দেখলেন, একটি পাখি ভয়ে চীৎকার করতে-করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই বাজের খাবার ভিতর ঝটপট করছে। তিনি শিশ দিয়ে বাজ-পাখিকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল; আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা-পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন; আর সেই তোতাপাখির জোড়া-পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে-ডাকতে সেই শিকারীদের সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চলল। শেষে, ক্রমে-ক্রমে আশ্বে-আশ্বে, ভয়ে-ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোট খাঁচায় ডানা ভাঙ্গা তার সঙ্গী তোতা ছটফট করছিল, সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বসল। ওমরাহ আশ্চর্য হয়ে ব'লে উঠলেন, “কি আশ্চর্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতী এসে আপনি ধরা দিয়েছে!” আল্লাউদ্দীন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছিলেন; হঠাৎ ওমরাহের মুখে এই কথা শুনে তাঁর মনে হল—যদি ভীমসিংহকে ধরা যায়, তবে হয়তো সেই সঙ্গে রাণী পদ্মিনীও ধরা দিতে পারেন।

বাদশা শিবিরে এলে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন! দু-একদিন পরেই রানার সঙ্গে কথাবার্তা স্থির হল যে, আল্লাউদ্দীন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা-যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে একমাত্র তিনি একখানি আয়নার ভিতরে রাজপুত-রাণী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন, ততক্ষণ তাঁর কোনো বিপদ না ঘটে সে জন্ত স্বয়ং মহারানা দায়ী রইলেন। বাদশা চিতোরে যাবার জন্ত প্রস্তুত



হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে, আল্লাউদ্দীন স্বপ্নেও ভাবেননি। তিনি মহা আনন্দে পাঠান-ওমরাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির করলেন। তারপর বৈকালে গোলাপ-জলে স্নান ক'রে, কিংখাবের জামাজোড়া, মোতির কণ্ঠমালা, হীরে-পান্নার শিরপ্যাচ প'রে, শাহেনশা শাদা ঘোড়ার উপর সোনার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন—সঙ্গে প্রায় দুশ' জন পাঠান-বীর—যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা! বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙে কেবলার দিকে উঠে গেলেন; আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নিচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল, তারপর আবার একে একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেবলার কাছে ফিরে এসে পথের প্রকাণ্ড একটা আগবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিমদিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন, সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন রানা ভীমসিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেতপাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না—কেবল হাজার-হাজার মোমবাতির আলো, সেই শ্বেতপাথরের রাজমন্দিরে, যেন আর-একটা নতুন দিনের সৃষ্টি করেছিল। রানা ভীম সেই ঘরে সোনার মছনদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়লা সরবৎ দিয়ে বললেন, “শাহেনশা, একটু আমিল ইচ্ছা করুন।” আল্লাউদ্দীন সেই আমিলের পেয়লা-হাতে ভাবতে লাগলেন—যদি এতে বিষ থাকে, তবে তো সর্বনাশ! রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি, শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে। বাদশা পেয়লা-হাতে ইতস্তত করতে লাগলেন। রানা ভীম আল্লাউদ্দীনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বললেন, “শাহেনশা, বিষের ভয় করবেন না। মহারানা স্বয়ং যখন আপনার কোনো বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী, তখন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে

আসেন, তবু একজনও রাজপুত্র আপনার গারে হাত তুলতে সাহস পাবে না ! আপনি নিশ্চিত থাকুন । অতিথিকে আমরা দেবতার মতো মনে করি ।” আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন, “রানা, আমি সে কথা ভাবছি নে । আমি ভাবছি লেম, আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি, তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না ?” আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল । তিনি অল্পে অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ ক'রে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন । শেষে যখন দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর-মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল, তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, “তবে আর বিলম্ব কেন ? এখন একবার সেই আশ্চর্য স্নন্দরী পদ্মিনী-রাণীকে দেখতে পেলেই খুশি হয়ে বিদায় হই !”

তখন রানা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দা সরিয়ে দিলেন—কাকচক্ষু জলের মতো নির্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার-হাজার বাতির আলো যেন আলোময় ক'রে প্রকাশ হল ! বাদশা দেখতে লাগলেন—সে কি কালো চোখ ! সে কি স্নটানা ভুরু ! পদ্মের মৃগালের মতো কেমন কোমল ছুখানি হাত ! বাঁকা মল-পরা কি স্নন্দর ছোট ছুখানি রাঙা পা ! ধানী রঙের পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ি, নীলার আংটি হীরের চিক্ ! বাদশা আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন—একি মানুষ না পরী ? আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না ; তিনি মছনদ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া-পদ্মিনীকে ধরবার জন্তে ছুহাত বাড়িয়ে ছুটে চললেন, গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায় ! ভীমসিংহ ব'লে উঠলেন—“শাহেনশা, পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না ।” রানার মনে হল, রাজ-দরবারের একদিকে বসে সত্যিই তাঁর পুণ্যবতী

রাণী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছেন ! রাগে রানার দুইচক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়লা সেই আয়নাখানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন—ঝন্-ঝন্ শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চূরমার হয়ে ভেঙে পড়ল । আল্লাউদ্দীন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন । তিনি মনে বুঝলেন, পাগলের মতো রাণীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়ই অভদ্রতা হয়েছে, এজ্ঞ রানার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার । বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বললেন, “রানা, আমার অন্তায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত, তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম—আমায় ক্ষমা করুন ।” তারপর অনেক তোষামোদ, অনেক অনুনয়-বিনয়ে রানাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন । পেয়ালার পর পেয়লা আমিল খেয়ে একেই রাণার প্রাণ খুলে গিয়েছিল, তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে যখন ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল—রানা আদর করে নতুন বস্ত্র দিল্লীর বাদশাহকে কেয়ার বাইরে পৌঁছে দিতে চললেন ।

অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার ; ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে ; চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই ; আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রানা ভীম আর কুড়িজন রাজপুত্র সৈন্য । আজ রানার মনে বড় আনন্দ—চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ; আর কখনো চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না । রানা যখন ভাবলেন, কাল সকালে পাঠান-সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা, কাল থেকে নির্ভয়ে রানা-রাণীর জয়-জয়কার দিয়ে, যে যার

কাজে লাগবে, তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরো অন্ধকার হয়েছে; পাহাড়ের গায়ে বড়-বড় নিম-গাছ, কালো কালো দৈত্যের মতো, রাস্তার দুই ধারে সারি-বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। আর-কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল কেল্লার উপর থেকে এক-একবার প্রহরীদের হে-হে আর পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট।

আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহকে নিয়ে কথায়-কথায় ক্রমে পাহাড়ের নিচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের ক্ষেত, আর-একদিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা। এই রাস্তার দুই ধারে প্রায় দুশ' পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মতো লুকিয়েছিল। ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন, অমনি হঠাৎ চারদিক থেকে পাঠান-সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেললে; তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত-শত শত্রুর মাঝে কুড়ি-জন মাত্র রাজপুত তাদের রানাকে উদ্ধার করবার জন্তে প্রাণপণে যুদ্ধে লাগল! কিন্তু বৃথা! বাজ-পাখি যেমন ছোঁ-মেয়ে শিকার নিয়ে যায়, তেমনি পাঠান আল্লাউদ্দীন, রাজপুতদের মাঝখান থেকে রানা ভীমকে বন্দী ক'বে নিয়ে গেলেন। কুড়িজনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র রাজপুত চিতোরে ফিরল! প্রতিপদের সকালবেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল—ভীমসিংহ বন্দী হয়েছেন; পদ্মিনীকে না দিলে তাঁর মুক্তি নেই!

আল্লাউদ্দীন যখন শিবিরে পৌঁছলেন, তখন রাত্রি আড়াই প্রহর। তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন। আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, রানা যখন ধরা পড়েছেন, তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়! হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্তে প্রাণ দিতে পারে, বাদশার বেগম হতে কি রাজ্ঞী হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রানাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না!—আল্লাউদ্দীন মনে-মনে এই প্রতিজ্ঞা

ক'রে সোনার খাটিরায় ছুধের কেনার মতো ধপধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরাণী পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষ-রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন ! সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন, এইবার পদ্মিনী আসছেন । সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল, পদ্মিনী এলেন না । দিনের পর দিন, রাতের পর রাত চলে গেল, তবু পদ্মিনীর দেখা নেই । বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন ! তাঁর মনে হতে লাগল এ ভীমসিংহ কি আসল ভীমসিংহ নয় ? আমি কি ভুল ক'রে সামান্য কোনো সর্দারকে বন্দী ক'রে এনেছি ? আল্লাউদ্দীন বন্দী রানাকে ছজুরে হাজির করতে ছকুম দিলেন । লোহার শিকলে বাঁধা রানা ভীম বাঁধা সিংহের মতো বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন । শাহেনশা জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ ?” রানা উত্তর করলেন, “পাঠান ! এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন ?” আল্লাউদ্দীন বললেন, “যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ, তবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্তে রাজপুতদের কোনোই চেষ্টা দেখছি না যে !” রানা বললেন, “যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে চিতোরের মহারানা বোধহয় আর কোনো সম্বন্ধ রাখতে চান না !” কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগলো—যদি সত্যই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকেন ! আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন ।

সেই দিন শেষ-রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাদে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন । নীল পদ্মের মতো তাঁর দুটি সুন্দর চোখ পাঠান-শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিংহ বন্দী ছিলেন, সেই দিকে—চেয়ে ছিল । আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি, পূর্বদিকে সূর্যের আলো সোনার তারের মতো দেখা দিয়েছে মাত্র, এমন সময় দুজন রাজপুত-সর্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম করলেন । একজনের নাম গোরা, আরেকজনের নাম বাদল ! গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর, আর

তার বড়-ভাইয়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর ঠারো। গোরা বাদল ছুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ীর লোক। রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রাণী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক-হাতে তলোয়ার, আর-হাতে মা-বাপ-হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরের এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, “মহারানা কি আমার কথা-মতো কাজ করতে রাজী হয়েছেন?” গোরা বললেন, “তাঁরই হুকুমে রাণীজিকে পাঠান-শিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করার জন্তে এখনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।” পদ্মিনী একটু হেসে বললেন, “যাও, বাদশাকে বোলো, আমার জন্তে যেন দিল্লীতে একটা নতুন মহল বানিয়ে রাখেন।”

গোরা বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে-দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ ক’রে সূর্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন, আল্লাউদ্দীনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড শিবির সকালবেলার সূর্যের আলোর ক্রমে-ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল। তিনি বাদশাহের সেই কানাতের দিকে চেয়ে-চেয়ে ব’লে উঠলেন—“ধূর্ত পাঠান, তোতে-আগাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল। দেখি, কার কতদূর ক্ষমতা!”

সেদিন শুক্রবার, মুসলমানদের জুম্মা। আল্লাউদ্দীন ফজিরের নমাজ ক’রে দরবারে বসেছেন, এমন সময় মহারানার চিঠি নিয়ে গোরা বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহারানার মোহর-করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা রয়েছে—“পদ্মিনীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল, তার বদলে রানা ভীমসিংহের মুক্তি চাই। আরও রাজরাণী পদ্মিনী সামান্য জ্বীলোকের মতো দিল্লীতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখিরাও যাতে পদ্মিনীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারেন, বাদশাহ যেন সে বন্দোবস্ত করেন; তাছাড়া চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে শাহেনশার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্তে যে-সব বড়-বড় ঘরের রাজপুতনী

সঙ্গে যাবেন, তাঁদের যাতে কোনো অসম্মান না হয়, সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছু দূরে সরিয়ে রাখবেন। শেষে মহারানার ইচ্ছে যে, এর পর থেকে আল্লাউদ্দীন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন।” চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল; তিনি হাসিমুখে গোরা ও বাদলের দিকে ফিরে বললেন, “বেশ কথা! আমি আজ রাত্রে মধ্যই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রাণীর আসবার কোনোই বাধা হবে না। তোমরা মহারানাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজী হলেম।”

গোরা বাদল বিদায় হলেন। বাদশা, কেল্লার সামনে থেকে সমস্ত সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অল্প জায়গার উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বললেন—তাঁরুকানাত, গোলাগুলি, অস্ত্রশস্ত্র, আসবাব-পত্র যেখানকার সেইখানে থাক, কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে একদিনের মতো অল্প কোথাও আশ্রয় নিক। তাতেও প্রায় সমস্ত রাত কেটে গেল।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপালের উপর কড়কড়-শব্দে নাকড়া বাজতে লাগলো। বাদশা দেখলেন, চিতোরের সাতটা ফটক একে-একে পার হয়ে, চার-চার বেহারার কাঁধে, প্রায় সাতশ’ ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে—মাঝে রাণী পদ্মিনীর চিনা-পোত-মোড়া সোনার চতুর্দোল; তার এক-পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দার গোরা, আর এক পাশে বারো বৎসরের বালক বাদল—কুজনেই ঘোড়ায় চড়ে। পদ্মিনী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্তে বাদশা প্রায় আধ-ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন। একে-একে যখন সেই সাতশ’ পালুকী কানাতের ভিতর পৌঁছল, তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন, “শাহেনশা, রাণীজি উপস্থিত; এখন তিনি একবার ভীম-সিংহের সঙ্গে দেখা করতে চান—বাদশাহের বেগম হলে আর তো কুজনে

দেখা হবে না।” বাদশা বললেন, “পদ্মিনী যখন রানাকে দেখতে চেয়েছেন, তখন আর কথা কি ! আমি আধঘণ্টা সময় দিলেম, তার বেশি রানা যেন পদ্মিনীর কাছে না থাকেন।” গোরা তখালু ব'লে বিদায় হলেন ।

আল্লাউদ্দীন একলা বসে দেখতে লাগলেন—এক, দুই ক'রে প্রায় সাতশ' পালুকি, কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে, চিতোরের মুখে চলে গেল ; সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বারো বৎসরের বাদল । বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এ সব পালুকিতে কারা যায় ?” শুনলেন, চিতোর থেকে যে-সকল বড়-ঘরের রাজপুতনী রাণীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা ফিরে গেলেন । বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, “ভীমসিংহ কোথায় ?” উত্তর হল, “অন্দরে আছেন ।”

আল্লাউদ্দীন শিবিরের এক-কোণে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে । এইবার পদ্মিনীর সঙ্গে দেখা হবে । বাদশা সাজগোজ করবার জন্তে অল্প এক শিবিরে উঠে গেলেন । সেখানে আতর-গোলাপ, হীরে-জহরতের ছড়াছড়ি ।—কোথাও সোনার আতর-দানে হাজার-টাকা ভারি গোলাপী আতর, কোথাও মুস্তোর তাজ, পাল্লার শিরপ্যাচ, কোটো-ভরা মানিকের আংটি, আলনার সাজানো কিংখাপের জামাজোড়া রেশমী রুমাল, জরির লপেটা ।

বাদশা যতক্ষণ কিংখাপের জামাজোড়া, জরির লপেটা প'রে আয়নার সম্মুখে পাকা দাড়িতে গোলাপী আতর লাগাচ্ছিলেন, ততক্ষণ সেই সাতশ' পালুকির একখানিতে রানা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছা-বাছা রাজপুত-সর্দারেরা পাঠান-শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছিলেন । ক্রমে আল্লাউদ্দীনের সাজগোজ সাজ হল । আধঘণ্টা শেষ হয়ে এক-ঘণ্টা পূর্ণ হতে চলল, এখনও পদ্মিনীর শিবির থেকে ভীমসিংহ ফিরে এলেন না ! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন ;



গোরার কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না ! আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পারলেন না, ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেখানে আধক্রোশ জুড়ে কানাত খাটানো হয়েছিল, সেইখানে উপস্থিত হলেন ; দেখলেন পদ্মিনীর সোনার চতুর্দোল শূণ্য পড়ে আছে । যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রাণী পদ্মিনীকে মানিকের খাঁচায় সোনার পাখিটির মতো পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন, সে শিবির অন্ধকার ! কোথায় পদ্মিনী, কোথায় তাঁর একশ' সখী, আর কোথায় বা বন্দী রানা ভীমসিংহ ! পাঠান-শিবিরে হুলস্থূল পড়ে গেল । সকলেই শুনলে পাল্কি-বেহারা সঙ্গে রাজপুতেরা বন্দী রানাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল ।

বাদশা তখনই সমস্ত সৈন্য জড়ো করতে হুকুম দিয়ে দুহাজার ঘোড়-সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন ।

সবেমাত্র রানার পাল্কি চিতোরের ফটক পার হয়েছে, এমন সময়, পাঠান বাদশার ঘোড়-সওয়ার কালবৈশাখীর ঝড়ের মতন ধূলিধবজার চারদিক অন্ধকার ক'রে, দীন-দীন-শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপর পড়ল ।

তখন বেলা দুই প্রহর । আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বালক বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা, একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন । সন্ধ্যা হয়ে এল, তবু যুদ্ধ শেষ হল না । চিতোর থেকে দলের পর দল রাজপুত এসে যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল ; বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্যন্ত দখল করতে পারলেন না ! শেষে, যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন সেই ভীমসিংহ যখন হাতীর পিঠে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, তখন পাঠান-বাদশার আশা ভরসা নিমূল হল ! সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্ধেক-ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন । জয় ! জয় ! রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল ।

সেইদিন গভীর রাতে যুদ্ধ-শেষে রানা ভীমসিংহ যখন পদ্মিনীর শয়ন-কক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন, তখন রানার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, “এ সূখের দিনে চক্ষে জল কেন ?” রানা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “পদ্মিনী, আজ আমার পরম-উপকারী চিরবিধ্বাসী গোরা, চিরদিনের মতো যুদ্ধে খেলা সাজ ক’রে, দেবলোকে চলে গেছে।” হৃদয়ে আর একটিও কথা হল না ! রাণী পদ্মিনী শয়ন-ঘরের প্রদীপ অন্ধকার ক’রে দিলেন ; দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে যেন একটা হায়-হায় হায়-হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল।

আল্লাউদ্দীন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন, সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু-একটু ক’রে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজপুত্রের কাছে হার-মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন—মোগল-বাদশা তৈমুর লং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন ; তার এক-জায়গায় বেগম লিখেছিলেন, “শাহেনশা, আর কেন ? পদ্মিনীর আশা পরিত্যাগ করুন। হে মধুকর, তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে, আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক লুটে গেল ! সকলি আল্লার ইচ্ছা ! আজ অর্ধেক-ভারতবর্ষের রাজা, কাল হয়তো পথের ভিখারী ! হায় রে হায়, দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল-দস্যুর বাঁদী হতে হল !” বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন। বিপদ যে এত গুরুতর, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাতে হুকুম দিলেন। সেই রাতে পাঠান-ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল।

তের বৎসর পরে, চিতোরের সম্মুখে পাঠান-বাদশার রণডঙ্কা আর-

একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুর্গবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে—দেশ প্রায় বীরশূন্য; নতুন-নতুন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রানা ভীমসিংহ সেই সব নতুন সৈন্য, নতুন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে-গ্রামে, পথে-পথে, পাঠান-সৈন্যকে বাধা দিতে লাগলেন; কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল।

যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হাটিয়ে দিয়ে, গ্রামের পর গ্রাম, কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে করতে একদিন আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহী ফৌজ চিতোরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্দী তাঁবু সাজিয়ে, রাজপুতের সঙ্গে, শেষ-যুদ্ধের জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা, চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না ক'রে দিল্লী ফেরা নয়!

মলিনমুখে রানা ভীমসিংহ চিতোর গড়ে ফিরে এলেন। মহারানা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বললেন, “কাকাজি, এত দিনে বুঝি চিতোর-গড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নেই! প্রজাসকল হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত। এখন কি নিয়ে, কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?” ভীমসিংহ বললেন, “চিতোর এখনও বীরশূন্য হয়নি, এখনও আমরা এক-বৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি, এমন ক্ষমতা রাখি!” লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন, “কাকাজি, আর যুদ্ধ বৃথা! আমি বেশ বুঝতে পারছি, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নেই; তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ-জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে! আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে, যদি আগুন নিভে যায়, তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করার ক্ষতি কি? না-হয় কিছুকাল পাঠান-বাদশার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম।” ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল; তিনি মহারানার দুটি হাত

ধরে বললেন, “হায় লছমন, মনে বেশ বুঝছি আর উপায় নেই, তবু আমার একটি অনুরোধ আছে। দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন বাপ গেলেন, তখন আমিই ছোকে ছেলের মতো বুকে টেনে নিয়ে-ছিলেম ; সমস্ত বিপদ আপদ, রাজ্যের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা তোরই হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম। আজ আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস। সাত দিন সময় দে। আমি এই শেষবার চিতোর-উদ্ধারের চেষ্টা দেখি ! এই সাত দিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাত দিনে যেন আমার হুকুম মহারানার হুকুম জেনে সকলে মাগ্ন্য করে।” লক্ষ্মণসিংহ বললেন, “তথাস্তু।”

সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুম মতো এক-এক জন রাজপুত-সর্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন !

প্রতিদিন খবর আসতে লাগল—আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন—চিতোরের ঘরে-ঘরে হাহাকার উঠল ! সেই হাহাকার, সেই হাজার-হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন, পদ্মসরোবরের মাঝখানে, যেখানে রাজরাণী পদ্মিনী শ্বেত পাথরের দেব-মন্দিরে পূজায় বসেছিলেন, সেইখানে পৌঁছল। পদ্মিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূজা সাঙ্গ করলেন। তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার অনাথ শিশুর জন্তে সারা দিন, সারা সন্ধ্যা কেবলি কাঁদতে লাগল।

ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় ক’রে বললেন, “প্রভু, আর কত দিন যুদ্ধ চলবে ?” ভীমসিংহ বললেন, “তিন দিন মাত্র। কিন্তু যুদ্ধে আর কোনো ফল নেই, রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নেই। এখন উপায় কি ? সূর্যবংশের মহারানাকে এইবার বুঝি পাঠান-বাদশার তালুকদার হতে হল !” পদ্মিনী জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, চিতোর রক্ষার কি কোনোই উপায় নেই ?” ভীমসিংহ বললেন, “উবরদেবী যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষে ! হায় পদ্মিনী, কার পাপে

চিতোরের এ দুর্দশা হল।” তারপর, দু-একটি কথার পর ভীমসিংহ অস্ত্র  
কাছে চলে গেলেন।

একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলি বাজতে লাগল—হায় পদ্মিনী কার  
পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দশা! অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত  
করে ব’লে উঠলেন, “হায়, হতভাগিনী পদ্মিনী, তোরই এ পোড়ারূপের  
জন্তে এ সর্বনাশ—তোরই জন্তে এ সর্বনাশ!”

নিঃশব্দে ঘরে প্রতিধ্বনিত হল—“তোরই জন্তে এ সর্বনাশ।”

ঠিক সেই সময় চৈত্র মাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড়-বড়  
কোঁটায় বৃষ্টি নামল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে নিজের  
মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবরদেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, উবরদেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল  
একটিমাত্র প্রদীপের আলো! সেই আলোর বসে দেবীর ভৈরবী, রাজরাণী  
পদ্মিনীকে বললেন, “মহারাণী, আমি আবার বলি, তুমি যে-কাজ করতে  
যাচ্ছ, তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রক্ত অলঙ্কার একবার অঙ্গে পরলে  
আর নিস্তার নেই! ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ  
হতে হবে!” পদ্মিনী বললেন, “হে মাতাজি, আশীর্বাদ করুন, যে রূপসীর  
জন্তে রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে, তার সেই পোড়া-রূপ জ্বলন্ত  
আগুনেই ভস্ম হোক।” ভৈরবী বললেন, “তবে তাই হোক। বৎসে,  
আমি আশীর্বাদ করি, যে চিতোরের জন্তে তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ  
করলে, সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে; যে  
মহাসতীর রক্ত-অলঙ্কার আজ তুমি পরতে চললে, সেই মহাসতী মরণান্তে  
তোমায় যেন চরণে রাখেন।” রাণী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি  
চন্দন কাঠের কোঁটার উবরদেবীর সমস্ত রক্ত-অলঙ্কার নিয়ে বিদায় হলেন  
সেইদিন রাত্রি প্রায় আড়াই-প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি  
সাড়াশব্দ ছিল না—মহারানী নির্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত

শ্রদ্ধা, পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে, দেশে শান্তি আসবে মনে করে নিশ্চিত মনে ঘুমিয়েছিল, সেই সময় সমস্ত মেবারের রাজা, ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা লক্ষ্মণসিংহের চোখে ঘুম ছিল না। হার অদৃষ্ট ! কাল সন্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে, এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না ! রাজ্য, সম্পদ, মান, মৰ্যাদা আত্মীয়স্বজন সব ছেড়ে কোন দূরদেশে সামান্ত বশে নির্বাসনে যেতে হবে। মহারানা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চারদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর-সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, ধামের পর ধামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—একটিমাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরো যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল ! মহারানা অস্তঃপুরে যাবার জন্তে উঠে দাঁড়ালেন !

হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠল ; তারপর মহারানা অনেকখানি কুলের গন্ধ আর অনেক নুপুরের ঝিন্-ঝিন্ শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! মহারানা ব'লে উঠলেন, “কে তোরা ? কি চাস ?” চারিদিকে—দেয়ালের ভিতর থেকে, ছাদের উপর থেকে, পায়ের নিচে থেকে শব্দ উঠল--“ম্যয় ভূখা হঁ !” লক্ষ্মণসিংহ বললেন, “আঃ, এত রাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে ?” আবার শব্দ উঠল —“ম্যয় ভূখা হঁ !” তারপর, গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি সেই শয়ন-ঘরের অন্ধকারে এক অপক্লপ দেবীমূর্তি ধীরে-ধীরে উঠল ! মহারানা বলে উঠলেন, “কে তুমি, দেবতা না দানব, আমায় ছলনা করছ ?” লক্ষ্মণসিংহ দীপদান থেকে সোনার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীটকুণ্ডলে, রত্ন-অলঙ্কারে, অসংখ্য-অসংখ্য মণিমাণিক্যে হাজার-হাজার আগুনের শিখার মতো দগ-দগ করে জ্বলতে লাগলো। লক্ষ্মণসিংহ দেখলেন—

চিতোরেশ্বরী উবরদেবী ! ভয়-ভক্তি বিশ্বমে মহারাণার সর্বশরীর অবশ  
হয়ে এল—পরমানন্দে দুর্বল তাঁর হাত থেকে সোনার প্রদীপ খসে পড়ল !  
তারপর, সব অন্ধকার ! সেই অন্ধকারে মহারানা স্বপ্ন দেখছেন, কি ভ্রমে  
আছেন, বুঝতে পারলেন না ! তিনি যেন গুনতে লাগলেন, দেবী  
বলছেন—“ময়র ভুখা হ’ !—বড়ো ক্ষুধা, বড়ো পিপাসা, আমি মহাবলি  
চাই—রক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নেই ! মহারানা ! ওঠ, জাগো,  
দেশের জন্ত বুকের রক্তপাত কর—আমার খর্পর রক্তের শতধারায়  
পরিপূর্ণ কর ! রাজা-প্রজা, বালক-বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ  
করে, তবেই কল্যাণ ! না হলে, সূর্যবংশের রাজপরিবার আর কখনো  
চিতোরের সিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না !”

পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে, তেমনি সেই প্রকাণ্ড ঘরে  
দেবীর শেষকথা অনেকক্ষণ ধরে গম্-গম্ করতে লাগল ।

রাত্রি শেষ হয়ে গেল । উষাকালে সোনার আলো আর শীতল বাতাসের  
মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অস্তর্ধান করলেন ! অনেকদূরে পার্বতী-  
মন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী-রাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতি-গান বাজতে  
লাগল ।

প্রত্যুষে রাজদরবারে মহারানা লক্ষ্মণসিংহ যখন রাত্রে ঘটনা আর দেবীর  
আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ করলেন তখন সকলে বিস্মিত হল বটে,  
কিন্তু অনেকেই সে-কথা বিশ্বাস করলে না । যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল,  
ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্তে প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তারা  
উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল । আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ, মন দুর্বল,  
যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুরে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল,  
তারা ত্রিময় হয়ে পড়ল । কিন্তু সেই রাতে মহারানার আদেশে মেবারের  
ছোট-বড় সামন্ত-সর্দারেরা যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনবার  
জন্তে অস্তঃপুরে সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরের শুরু রাজপুরে

হাজার-হাজার রাজপুত্র-বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবী-মূর্তি  
“ময় ছুঁখা ছঁ !” ব’লে প্রকাশ হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো  
সন্দেহ রইল না—সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা  
নিমেষের মধ্যে দূর হল—আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায় !  
সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল ; কেবল রানা ভীমসিংহ যেন  
সেই দেবী-মূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে-মনে তোলা-পাড়া করতে  
লাগলেন—এ কি দেবী, না পদ্মিনী ? পদ্মিনী, না দেবী ?

তারপর, মহাবলির উদ্যোগ হলো । মহারানা লক্ষ্মণসিংহ তাঁর বারোটি  
রাজপুত্রের মধ্যে সর্বপ্রধান, সবচেয়ে বড় রাজকুমার, যুবরাজ অরিসিংহের  
মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বললেন, “হে ভাগ্যবান, দেবীর  
আদেশ শিরোধার্য কর । পাঠান-যুদ্ধে অগ্রসর হও ! আজ তুমি সমস্ত  
মেবারের মহারানা । এই সমস্ত সামন্ত-সর্দার তোমারই প্রজা ব’লে  
জানবে । আজ থেকে তোমারই হাতে যুদ্ধের ভার । জয় হলে তোমার  
পুরস্কার—ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন ; আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে  
তার ফল—পরলোকে মহাদেবীর অভয় চরণ ।” বৃদ্ধ রানা লক্ষ্মণসিংহ  
অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নিচে দাঁড়ালেন—নতুন রানার  
মাথায় চিতোরের কিরীট শোভা পেতে লাগল । চারদিকে রব উঠল—  
“জয় মহাদেবীর জয় !” জয় অরিসিংহের জয় ।” লক্ষ্মণসিংহ বলতে  
লাগলেন, “সর্দারগণ, আমার আর একটি শেষ কর্তব্য আছে । সে কর্তব্য  
দেবীর কাছে নয়, চিতোরের কাছে নয় ; আমার পিতা-পিতামহ স্বর্গীয়  
মহারানাদের কাছে । এই মহাসমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নিমূল  
না হয়, পরলোকে পিতৃপুরুষেরা যাতে জল-গণ্ডূষ পান, রাজস্থানে বাঙ্গার  
বংশ যুগে যুগে যাতে অমর থাকে, সেই জন্তে আমার ইচ্ছা, অজয়সিংহ  
নিজের ক্রীপুত্র নিয়ে কৈলোরের নির্জন দুর্গে চলে যান ।”

অজয়সিংহ মহারানার সম্মুখে জোড় হাত ক’রে বললেন, “পিতা, আমার



এগারো ভাই চিতোরের জন্ত যুদ্ধে প্রাণ দেবে, আর আমি কিনা  
 স্ত্রীলোকের মতো শিশু-সন্তান মানুষ করবার জন্তে বসে থাকবো ?  
 আমি কি এতই দুর্বল, এমনি অক্ষম ?” লক্ষ্মণসিংহ বললেন, “বৎস,  
 হতাশ হয়ো না, যে মহৎ কাজের ভার তোমায় দিলেম, চিতোরের  
 যে-কোনো রাজপুত্র সে-ভার পেলে নিজেকে ধন্য বোধ করত ! হয়তো  
 আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না, হয়তো তোমাকেও  
 চিতোরের জন্তে প্রাণ পণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে  
 পরাধীন রেখে চলে যাব, আর হয়তো তুমি সূর্য্যবংশের উপযুক্ত কোনো  
 বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায়  
 নিতে পারবে। মনে রেখো, চিতোরের জন্ত প্রাণ দেবার যে সুখ  
 চিতোর পুনরুদ্ধারের সুখ তার শতগুণ !” লক্ষ্মণসিংহ নীরব হলেন।  
 জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হলো।

রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে ব'লে  
 গেলেন, “চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যয়ো।”  
 যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ ক'রে অজয়সিংহ যখন বড় ভায়ের ঘরে  
 গেলেন, তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ ক'রে ছোট-ভায়ের দিকে  
 ফিরে বললেন, “ভাই, আজ আমাদের শেষ দেখা ; কাল তুমি এক-  
 দিকে, আমি একদিকে ! এই শেষ-দিনে তোমায় একটি কাজের ভার  
 দিচ্ছি !” অরিসিংহ চামড়ায়-মোড়া একটি ছোট থলি আর সেই চিঠি-  
 খানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বললেন, “অজয়, এ ছুটি যত্ন ক'রে  
 রেখ, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি, তবে আবার চেয়ে নেব ; নয়  
 তো তুমি খুলে দেখো আমার শেষ ইচ্ছা কি।” তারপর অজয়সিংহকে  
 আলিঙ্গন ক'রে অরিসিংহ বললেন, “চল ভাই, মায়ের কাছে বিদায় হই !”  
 সেইদিন শেষ-রাত্রে যখন রাজ-অস্ত্রপুর থেকে দুই রাজপুত্র দুইদিকে  
 বিদায় হয়ে গেলেন, তখন বারো ছেলের মা-জননী চিতোরের মহারাণী

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন - তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল ছুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল—যেদিক দিয়ে ছুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারানী বলতে লাগলেন, “প্রিয়ে, স্থির হও, ধৈর্য ধর, বুক বাঁধো, মহাকালের কঠোর বিধান নতশিরে শাস্ত-মনে বহন কর।” তার-পর রণরণ শব্দে রাজপুত্রের রণডঙ্কা দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল—যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা করলেন।

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানের বিরুদ্ধে রাজপুত্রের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলো! একের পর এক, এগারো জন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নেই, আর উপায় নেই! কিন্তু তবু রাজপুত্রের বীর-হৃদয় এখনও অটল রইলো।

চিতোরের শেষ দুই বীর, লক্ষ্মণসিংহ আর ভীমসিংহ, যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হতে লাগলেন। রানার হুকুমে যোবারের লক্ষ-লক্ষ সৈন্য-সামন্তের অবশেষ—ভীষণমূর্তি ভগবান একলিঙ্গের দশ-হাজার দেওয়ানী-ফৌজ একত্র হতে লাগল। তাদের একহাতে শূল, একহাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘ-ছালের অঙ্গরাখা, পিঠে একটা ক’রে প্রকাণ্ড ঢাল! তাদের আসবাবের মধ্যে এক ঘোড়া, এক কঞ্চল, এক লোটা—পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিল না। তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র একলিঙ্গজীর উপাসনা করত, মানুষের মধ্যে কেবলমাত্র মহারানার হুকুম মানতো। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্তা। ছোটখাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেতো না; কেবল মাঝে মাঝে ঘোর ছুঁদিনে, যখন চারদিকে শত্রু, চারদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসতো, যখন বিধর্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুলন্দরী—কি কুমারী, কি বিধবা, কি দশ বছরের কচিময়ে, কি ষোলো বছরের পূর্ণ যুবতী—চিতার আগুনে রূপর্যোবন

ছাই ক'রে দিয়ে চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জ্বর-ব্রত উদ্‌ঘাপন করত, যখন আর কোনো আশা, কোনো উপায় নেই, সেই সময়, হতাশ রাজপুত্রের শেষ-উৎসাহের মতো ছুর্ধ্ব, ছুর্দাস্ত এই দেওয়ানী-ফৌজ চিতোরের কেলায় দেখা দিত ! সত্তর বৎসর পূর্বে সমরসিংহের বিধবা রাণী কর্মদেবী একদিন কুতুবুদ্দিনের হাত থেকে ছেলের রাজ-সিংহাসন রক্ষা করবার জন্তে মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন ; সেইদিন একবার দেওয়ানী-ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কম পুরুষ পরে মহারানা লক্ষ্মণসিংহের হুকুমে দেওয়ানী-ফৌজ আর একবার চিতোরের কেলায় উপস্থিত হল ।

কালরাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগত-সংসার গ্রাস করেছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্রসূর্য যখন লুপ্ত হয়েছিল, সেই সময় চিতোরের মহা-শ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো-হাজার রাজপুত্র স্তন্যরীর জ্বর-ব্রত আরম্ভ হল ।

মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা স্তূড়ঙ্গের উপরে দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম-স্তন্যরী রাণী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ করলেন, “হে অগ্নি, হে পবিত্র উজ্জল স্বর্ণকান্তি, এস ! পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে থাক । হে অগ্নি, হে মহাতেজ, এস ! তুমি দুর্বলের বল, সবলের সহায় । হে দেবতা, হে ভয়ঙ্কর, আমাদের ভয় দূর কর, সস্তাপ নাশ কর, আশ্রয় দাও । লজ্জা নিবারণ, দুঃখবিনাশন, বহ্নিশিখা, তুমি জীবনের শেষগতি, বন্ধনের মহামুক্তি !” পদ্মিনী নীরব হলেন । বারোহাজার রাজপুত্রের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে ঘুরে-ঘুরে গাইতে লাগল—  
“লাজহরণ ! তাপবারণ !” হঠাৎ একসময় মহা কল্লোলে চারদিক পরিপূর্ণ ক'রে হাজার-হাজার আগুনের শিখা মহা আনন্দে সেই স্তূড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল । প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টলমল করে উঠল ! বারো-হাজার রাজপুত্রনীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনী অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন—

চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনাযুখ, মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে, এক-নিমেবে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল ! সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর থেকে চীৎকার উঠল — “জয় মহাসতীর জয় !” আল্লাউদ্দীন নিজের শিবিরে শুয়ে সে চীৎকার শুনতে পেলেন । তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন ।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের শ্রোতের মতো রাজপুত-সেনা হর-হর-শব্দে দিগদিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর তেজে পাঠান-সৈন্যের উপর এসে পড়ল ।

আল্লাউদ্দীনের তাতার-সৈন্য দেওয়ানী-ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেবের মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন, ছারখার হয়ে পলায়ন করলে ।

আল্লাউদ্দীন নতুন নতুন সৈন্য এনে বারম্বার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন—শ্রোতের মুখে বালির বাঁধের মতো তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল ।

আল্লাউদ্দীন নিজে একজন সামান্য বীরপুরুষ ছিলেন না ; এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড় বড় হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন ; কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল । বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল । আল্লাউদ্দীন বেশ বুঝলেন, আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নেই । একদিকে দিল্লীর বাদশাহী তক্ত, আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন—কোনটা থাকে কোনটা যায় । তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দীন নিজের সমস্ত ফৌজ একেবারে একসময়ে সেই বারো হাজার রাজপুতের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন । নিমেবের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ লক্ষ হাতি ঘোড়া সেপাই-শাজী প্রলয়-ঝড়ের মতো ধুলায় ধুলায় চারদিক অন্ধকার করে, দীন দীন শব্দে রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল । তারপর হঠাৎ একসময়, সমুদ্রের

তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনি সেই অগণিত পাঠান-সৈন্যের মাঝে কয়েক-হাজার রাজপুত্র কোনখানে লুপ্ত হল, কিছু আর দেখা গেল না। কেবল সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে সেই যুদ্ধরত অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্যমূর্তিলেখা চিতোরের রাজপতাকা একবারমাত্র সন্ধ্যার আলোর বিছ্যতের মতো চমকে উঠল; তার পরেই শব্দ উঠল—“আল্লা হো আকবর শাহনুশা কি ফতে!”—পাঠানের পায়ের তলায় মহারানার রাজ-চ্ছত্র চূর্ণ হয়ে গেল! সূর্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার ক’রে অস্ত গেলেন; রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপর দলে-দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল।

চিতোর হস্তগত হল।

পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথঘাট রক্তের স্রোতে রাঙা ক’রে তুললে; ধনধাণ্ডে, মণিমুক্তায়, লক্ষ-লক্ষ তাতার ফৌজের বড় বড় সিন্দুক পরিপূর্ণ হল! কিন্তু যে-রক্তের লোভে আল্লাউদ্দীন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান ক’রে দিলেন, যার জন্মে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন, সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি?

বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই স্তনলেন—পদ্মিনী আর নেই—চিতোর আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে!

সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর-দ্বার, মন্দির-মঠ ছাইভস্ম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল—কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রাণী পদ্মিনীর রাজমন্দির তেমনি নতুন, তেমনি অটুট রইল। আল্লাউদ্দীন সেই রাজ-মন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে স্বেতপাথরের বারাণ্ডায়-ঘেরা পদ্মিনীর শয়ন-মন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম করলেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুত্রের হাতে চিতোরের-শাসনভার দিয়ে, ধীরে-ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন। পাঠান-বাদশার প্রবল প্রতাপ, হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর-এক দিকে বিস্তৃত হল; আর সেই বারো-হাজার সতী-লক্ষীর পবিত্র

নাম, বারো-হাজার রাজপুত-বীরের কাঁতি, চিরদিনের জন্তে, অগত-  
সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিত্তোরে মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর  
সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়; তার ভিতর মাছুষে প্রবেশ করতে পারে না—  
একটি অজগর সর্প দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।





शश्वि





চিত্তের তখনও পাঠানের হস্তগত হয়নি। মেবারে তখনও ভীমরানার অটুট প্রতাপ। মহারানা লক্ষ্মণসিংহের সুলাসনে দেশ যখন শান্তিতে সুষে ধনে ধাত্রে পরিপূর্ণ, সেই সময় একদিন যুবরাজ অরিসিংহ দলবল নিয়ে শিকারে গিয়েছিলেন। আন্ধোয়া বনের ধারে উজলা গ্রামে মেঠো রাস্তায় শিকারীর দল রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে শিকারের পিছনে ছুটে চলেছিল—শিকার একটা ছুঁচোলা-মুখ দাঁতালো বরাহ। বেলা দুপুরে মেঠো রাস্তায় অনেকখানি ধুলো উড়িয়ে অনেকদূর ছুটে গিয়ে রাজকুমারের শিকার রাস্তার একধারে জনার ক্ষেতের ভিতর কাঁপিয়ে পড়ল—সেখানে ঘোড়া চলে না, তীর তো ছোট্টই না।

ক্ষেতের মাঝে মাচার উপর দাঁড়িয়ে এক রাজপুত্রের মেয়ে এই তামাসা দেখছিল—পরনে তার পীলা ওড়নি, নীল আঙ্গিয়া। রাজকুমারের গায়ে ছিল সবুজ দোপাট্টা। ছুঁচনের চোখ ছুঁচনের উপর পড়েছিল। শিকারের আশায় হতাশ হয়ে অরিসিংহ যখন বুনাসু নদীর তীরে আমবাগানে ফিরে চলেছিলেন, ক্ষেতের ভিতর থেকে রাজপুত্রের মেয়ে সেই সময় বরাহটা মেরে শিকারীদের ভেট দিয়ে গেল।

রাজকুমার বিজ্ঞাসা করলেন, “ক্যায়সে মারা ?”

বালিকা বল্লমের মতো সিধে একটা জনারের শিব দেখিয়ে বললে— “ইসিসে ঘায়েল কিয়া।” তার ধুলোমাখা কালো চুলগুলি সাপের ফণার মতো সুন্দর মুখের চারিদিকে বড় শোভা ধরেছিল। তার সুডৌল হাতে পিতলের কঁকন সূর্যের আলোয় সোনার মতো কেমন ঝক্ ঝক্ করছিল। বুনাসু নদীর তীরে আমবাগানের শীতল ছায়ায় সেই কথাই ভাবতে ভাবতে রাজকুমারের তন্দ্রা আসছিল।

সবুজ ক্ষেতের মাঝে মাটির ঢেলা ফেলে পাখি আর ছাগল তাড়াতে তাড়াতে মেয়েটিও রাজকুমারের কথা ভাবছিল কিনা কে জানে ; কিন্তু এক সময় তার হাত থেকে ঠিকরে একটা মাটির ঢেলা সেই আম-

বাগানের ধারে ঘোড়ার পায়ে এসে লাগল। হঠাৎ ঘোড়ার তড়বড় শব্দে চমকে উঠে রাজকুমার চেয়ে দেখলেন আমবাগানের কাঁকে একটুখানি সবুজ ক্ষেত—তারই মাঝে সেই নীল-আঙ্গিয়া, পীলা-ওড়নি কৃষক-নন্দিনী!

পশ্চিম বাতাসে অড়রের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে, একদল টিয়া পাখী কাঁক বেঁধে উড়ে চলেছে, বেলা-শেষে দিনের আলো নিবু-নিবু, পাথরের মতো পরিষ্কার আকাশ, তার কোলে কালো মেঘের সরু রেখা—রাজকুমার শিকার শেষে বাড়ি চলেছেন। নদীর ধারে যেখানে গ্রামের পথ আর মাঠের রাস্তা এক হয়েছে সেইখানে দুজনে আবার দেখা হইল—বালিকা মাথার ছুধের কলসী নিয়ে মাঠ ভেঙে গ্রামে চলেছে—সঙ্গে দুটি চিকন কালো ছানা ভঁঁষ।

পরদিন উজলা গ্রামের সেই বালিকার ঘরে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে রাজকুমারের দূত এল। বালিকার পিতা চন্দাসো বংশের চৌহান রাজপুত্র কিছুতেই গেহলোট বংশে কন্যাদানে সম্মত নয়—রাজকুমার ক্রোধে হয়ে রাজ্যে ফিরলেন। এদিকে সেই বৃদ্ধ রাজপুত্রের ঘরে গৃহিণীর কাছে পাড়াপড়শীর দুয়ারে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা পরিসীমা রইল না। একই কাজও করে? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে আছে? যেমন বুদ্ধি, তেমনি চিরটা কাল চাষা হয়েই থাক।

বুড়ো কিন্তু সর্কলের কথায় একই জবাব দিত, “তোমরা যাই বল, আমি কিন্তু লক্ষ্মীকে কখনই রাজবাড়িতে পাঁচ সতীনের দাসী করে দিতে পারিনি; তার চেয়ে আমার মেয়ে গরীবের ঘরে গিন্নী হয়ে থাকে সে ভালো।”

কিন্তু বুড়োর প্রতিজ্ঞা বেশীদিন রইল না। চিতোর থেকে দূত এল, পদ্মিনী রাণী লিখেছেন, “আমি নিঃসন্তান, তোমার কন্যাকে ভিক্ষা চাই; আমার আশীর্বাদে চিতোরের রাজলক্ষ্মী তোমার বংশকে বরণ করুন।”

সতীর কথা ব্যর্থ হয় না। লছমীর সন্তান যে চিতোরের সিংহাসনে বসবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। ধূমে-ধামে আলো জালিয়ে, ঘোড়া সাজিয়ে বর-বেশে যুবরাজ এলেন যেন কোন স্বপ্নের রাজ্য থেকে। রাজপুত্র এসে উজলা গ্রামে উদয় হলেন—আনন্দে, আলোয়, নাচে-গানে সমস্ত গ্রাম এক রাত্রে মতো উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সুখের বাসর আনন্দের মধ্যে কখন কাটল বোঝা গেল না।

এক বৎসর পরে যুবরাজ লছমীরানীকে আর এক মাসের শিশু রাজপুত্র হাম্বিরকে উজলা গ্রামে রেখে পাঠানের সঙ্গে যুক্ত গেলেন। সে যুক্তি কে গেল তাকে আর কিরতে হল না। রানা গেলেন, রাজপুত্রেরা গেলেন, ভীমসিংহ গেলেন, রাণী পদ্মিনী, রাজবধু, রাজমাতা, সকলে গেলেন। চিতোর-লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলেন। রইলেন কেবল উজলা গ্রামে হাম্বিরকে নিয়ে রাণী লছমী, আর কৈলোরের কেল্লায় মেবারের রানার বংশধর অজয়সিংহ।

একদিকে শোরোনাল ব'লে একখানি ছোট গ্রাম, আর একদিকে আরাবল্লী পর্বত, মাঝে একটা ছোট পাহাড়ের উপর কৈলোরের পুরাতন কেল্লা। এক সময়ে পাহাড়ি ভীলদের শাসনে রাখার জগে এই কেল্লা প্রস্তুত হয়েছিল। তখন চিতোরের মহারানারা বছরের মধ্যে ঠাণ্ডা চারমাস এইখানে কাটাতেন। তখন কেল্লার শ্রী-ই ছিল এক! তারপর পাহাড়ি জাত যখন ক্রমে অধীন হয়ে শক্রতা ছেড়ে বশুতা মানলে তখন আর বড় একটা এখানে আসবার প্রয়োজন হত না। কচিং দুই একজন রাজকুমার শিকারে এসে রাত্রিবাস করে যেতেন। কেল্লাও ক্রমে ভেঙে-চুরে বন-জঙ্গল আর কাঁটা গাছে পরিপূর্ণ হয়েছিল।

বড় বৃষ্টি বিছাটের মাঝে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহের বংশধর রাজ্যহারা অজয়সিংহ স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে একদিন এই কেল্লার আশ্রয় নিলেন। সে দুঃখের রাত কি দুঃখে কেটেছিল, কে বলবে! মাথার

উপরে ফাটা ছাদ দিয়ে বৃষ্টির ধারা পড়ছে ঘরের কোণে ইন্দুরের খুঁটাট, বাহুড়ের ঝটাপট—রাজার ছেলে রাজার বোঁ তারই মাঝে ভিজ্জে ঘরে খড়ের বিছানায় ঘোড়ার কঞ্চল ঢাকা দিয়ে রাত কাটালেন। সকালে গ্রামবাসীরা রাজা দেখতে এসে দেখলে তাদের রাজার বসবার সিংহাসন, শোবার খাটিয়া নেই; রাজার রানী, রাজার ছেলে ঘোড়ার কঞ্চলে বসে আছেন। মেবারের রানী অজয়সিংহ আজ কোথায় সোনার সিংহাসনে রাজচ্ছত্র মাথায় দিয়ে বসবেন, রানীমা কোথায় ছুই রাজকুমার অজয়সিংহ সূজনসিংহকে নিয়ে গজদন্তের পালঙ্কে আরাম করবেন, না তাঁদের এ দুর্দশা? গ্রামবাসীরা তখনই যত্ন ক’রে কেলা পরিষ্কার করতে লাগল, ঘর সাজাতে লাগল, গ্রামের জোতদার গজদন্তের খাট সিংহাসন কিংখাবের সূজনী, জরীর টাঁদোয়া, শ্বেত চামর, চন্দনের পাখা, রূপার প্রদীপ, সোনার বাটা, শ্বেত পাথরের বাসন হাজির করলে। ক্ষেত থেকে চাষির মেয়েরা তরি তরকারি, ঘিয়ের মটকি, দুধ দেবার গাই, ঘোড়ার ঘাস নিয়ে হাজির হল। দেখতে দেখতে সাজ-সরঞ্জামে কেলায় শ্রী ফিরে গেল। সন্ধ্যার সময় গ্রামবাসী তাদের রাজার মুখে, রানীর মুখে, ছুই রাজপুত্রের মুখে হাসি দেখে বিদায় হল।

ভক্ত প্রজার প্রাণপণ সেবায় অজয়সিংহ সব দুঃখ ভুললেন, কেবল চিতোর যে এখনও পাঠানের হস্তগত এ দুঃখ তাঁর মন থেকে কিছুতে গেল না। তিনি প্রায়ই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতেন, “হায়! সূর্য এখনো রাহুগ্রস্ত, রবে এ গ্রহণ শেষ হবে তা কে জানে! সেই সূদিনের প্রতীক্ষা ক’রে আমার কতকাল থাকতে হবে কে বলতে পারে!”

দিন যেতে লাগল। কিন্তু যে সূদিনের প্রতীক্ষায় অজয়সিংহ রইলেন, সে সূদিন বুঝিবা আর এল না। পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করতে অজয়সিংহ প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু তাঁর লোকবল অর্থবল কোথায়? বড় আশা ছিল ছুই রাজকুমার অজয়সিংহ সূজনসিংহ বড় হয়ে

পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করবে—কিন্তু হায়, বিধাতা সে সাথেও বাদ সাধলেন।

সেদিন বর্ষাকাল, মেঘের ঘটা আরাবল্লী পর্বতের শিখরে শিখরে কাজলের মতো ছায়া ফেলেছে। গ্রামের উপর ক্ষেতের উপর দিয়ে আলো-আঁধারের খেলা চলেছে। দুই রাজকুমার শিকারে বেরিয়েছেন, রাজা-রাণীতে মহলের ভিতর একলা আছেন।

সন্ধ্যা হল—রাজকুমারেরা ঘরে ফিরছেন না, রাণীমা এক একবার খোলা জানালায় চেয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে পশ্চিম মেঘের তীরে একটুখানি সোনার ঢেউ খেলিয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। রাত্রির অন্ধকার মেঘের অন্ধকারে গাঢ়তর হয়ে এল। রাণীমা রাজার সঙ্গে কথা বলছেন আর বারে বারে জানালার পানে চেয়ে দেখছেন।

রাজা বললেন, “তোমায় আজ আনমনা দেখছি যে?”

“কে জানে প্রাণটা কেমন করছে।” বলে রাণীমা উঠে গেলেন। দাসী এসে ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। টুপ টাপ্ ক’রে ক্রমে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

রাণীমা মলিন মুখে ফিরে এসে বললেন, “এরা যে দুভাবে সকাল থেকে শিকারে গেল, এখনো এলনা কেন?”

রানা বলে উঠলেন, “সে কি? এখনও এরা ফেরেনি? এই ঝড়-বৃষ্টিতে দুজনে কোথায় রইল?” বলতে বলতে কেল্লার উঠানে লোকের কোলাহল শোনা গেল। তখন মেঘ কেটে গিয়ে চন্দ্রোদয় হচ্ছে; রাজা রাণী দেখলেন গ্রামবাসী জনকয়েক কাকে যেন ধরাধরি ক’রে নিয়ে আসছে। একজন দাসী তাড়াতাড়ি এসে খবর দিয়ে গেল, “রাণীমা, দেখুন গিয়ে বড়কুমার অজিম বাহাদুরের কি হয়েছে।” বলতে বলতে লোকজনে ধরাধরি ক’রে রাজকুমারকে নিয়ে উপস্থিত হল। রাজা রাণী শুনলেন, পাহাড়ের উপর শিকার করতে গিয়ে মুঞ্জ বলে যে ভীল সর্দার, তার ছেলের সঙ্গে

শুজন বাহাদুরের হরিণ নিয়ে কি ঝগড়া হয়, ক্রমে লড়াই বাধে। বড়-  
কুমার তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মাথায় চোট পেয়েছেন।

রানা জিজ্ঞাসা করলেন, “আর শুজনসিং কোথায় গেলেন?”

লোকজনেরা মাথা চুলকে বললে, “আজ্ঞে তিনি ভালো আছেন,  
আমাদের তিনি পাঠিয়ে দিলেন। নিজে একটা চটিতে বিশ্রাম করছেন,  
এলেন ব’লে।”

পথের ধারে চটিতে বিশ্রাম করার মানে পাঁচ ইয়ারে মিলে সিদ্ধি টেনে  
আড্ডা দেওয়া। রানা বুঝলেন; বুঝেই বললেন, “বিপদের সময় বিশ্রাম  
না করলেই নয়।”

লোকজন সকলে বিদায় হল। রাজা রাণী রাজবৈষ্ণু আর দু-একজন দাসী  
অচৈতন্য অজয়সিংহকে ঘিরে রইলেন। সমস্ত রাত্রে রাজকুমারের  
চেতনা হল না। রাজবৈষ্ণু ঘাড় নেড়ে বললেন, “আঘাত সাজ্বাতিক।”

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমার একবার চোখ চাইলেন; একবার  
“মা” ব’লে ডাকলেন; তারপর ভাঙা খাঁচা ছেড়ে পাখী যেমন উড়ে যায়  
তেমনি রাজকুমারের সেই সোনার দেহ ছেড়ে প্রাণ-পাখী চলে গেল।

তারপর দিনের পর দিন কাটতে লাগল। অজয়সিংহ শোকে দুঃখে  
নিরাশায় দিন দিন ম্রিয়মান হতে লাগলেন। আর সেই দুর্দান্ত যুগ  
ডাকাত দিনে দিনে প্রবল হয়ে গ্রামবাসীদের উপর প্রজালোকের ঘরে  
বিষম উৎপাত আরম্ভ করলে। এমন কি দুঃস্থ ডাকাত এসে একদিন  
কৈলোরের কেলা পর্যন্ত লুট ক’রে গেল। ডাকাত অজয়সিংহের মুকুট  
কেড়ে নিয়ে তাঁর মাথায় তলোয়ারের চোট মেরে চলে গেল। বৃদ্ধ অজয়-  
সিংহ, নেশাখোর শুজন বাহাদুর—প্রজালোককে কে রক্ষা করে? এক  
দিকে পাঠানের উৎপাত আর একদিকে যুগ ডাকাতে নির্ধুর অত্যাচার  
ওদিকে আবার চারিদিকে খবর হল —রানা আর বেশী দিন বাঁচেন কিনা  
সন্দেহ। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল। সকলেই বলতে লাগল এতদিনে

বুঝি সূর্যবংশের গৌরব শেষ হয়। সুলজন বাহাদুর যে রাজ্য চালাতে পারেন, এমন তো বোধ হয় না।

রাজ্যের যখন এই দুর্বস্থা সেই সময় উজলা গ্রাম থেকে লছমীরানী হাশিরকে নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হলেন। রানার আখীর-স্বজন দেশের সর্দার সামন্ত যে যেখানে ছিলেন উপস্থিত। রানা সকালে সভা ক'রে বসেছেন, হাশির এসে প্রণাম করলেন। রানা আশীর্বাদ ক'রে হাশিরকে কাছে বসালেন। হাশিরকে দেখে আজ তাঁর দাদা অরিসিংহকে মনে হল। সেই নাক সেই চোখ; দাদার মতো তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ শরীর, গলার স্বর তেমনি মধুর গভীর। আজ অজয়সিংহের মনে পড়ল তাঁর দাদা অরিসিংহ পাঠানের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে যাবার আগে তাঁর হাতে একখানি চামড়ার খলি আর একখানি চিঠি দিয়ে বলেছিলেন, “এই চিঠিতে আমার শেষ ইচ্ছা লেখা রইল। আর এই খলিতে একখানি ছোরা রইল, হাশির বড় হলে এ দুটি তাকে দিও।”

রানা অজয় আজ তাঁর সমস্ত সামন্ত সর্দারের সম্মুখে অরিসিংহের নিজের হাতের ছোরা আর মোহর-করা সেই চিঠি হাশিরের হাতে দিয়ে বললেন, “বৎস, পড়ে দেখ, তোমার পিতার শেষ ইচ্ছা কি।”

পত্রে লেখা ছিল—

শ্রীরাম জয়তি

শ্রীগণেশ প্রসাদ

শ্রীকলিক প্রসাদ

মহারাজ অধিরাজ শ্রীঅরিসিংহ আদেশতু

অতঃপর অজয়সিংহজী ও মেবারের দশ সহস্র অধিকারের সামন্ত সর্দার ও জনপদবর্গকে আমার আদেশ এই যে—ভবানী মাতার ইচ্ছায় পাঠান যুদ্ধ সঙ্কট সময়ে যদি আমার স্বর্গলাভ ঘটে, তবে দেশাচার মতো ভাইজী অজয়সিংহ একলিঙ্গজীর দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া যথাবিহিত প্রজাপালন ও

রাজ্যচালনা করিতে থাকিবেন ও আমার বিধবা পত্নী রাণী লছমীও শিশুপুত্র হাধিরকে লইয়া বাহাতে স্মৃতে স্বচ্ছন্দে উজলা গ্রামে বাস করিতে পারেন সেজন্য উজলা গ্রাম ও তাহার সংলগ্ন সমুদয় জমি-জমা রাণীর নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। আমি নিজ বুদ্ধি ও বিশ্বাস মতো দেওয়ানীর বন্দোবস্ত করিয়া গেলাম, কিন্তু ইতঃপর সিংহাসন লইয়া হাধির ও ভাইজীর সম্মানগণের মধ্যে বিবাদ ঘটবার সম্ভাবনা, সে নিমিত্ত শেষ অনুরোধ এই যে, আমাদের সামন্ত-সর্দার-মন্ত্রীবর্গ এবং প্রজালোক বাহাকে উপযুক্ত বিবেচনায় দেওয়ানীতে বহাল করিবেন তিনিই রাজ্যাধিকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন। হাধির ও অন্যান্য কুমারের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাঁহারা এই উত্তরাধিকার-সূত্র লইয়া বিবাদ না করেন। দেশের সঙ্কট অবস্থা—এ সময়ে গৃহ-বিবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। আমাদের মধ্যে যে কুসম্মান এই গৃহ-বিবাদে লিপ্ত হইবে, ভগবান একলিঙ্গের অভিশাপ যেন তাহাকে স্পর্শ করে। ইতি সন্থং ১৩৩৩ চিত্তৈরগড়।”

পত্রপাঠ শেষ হলে রানা সকলের দিকে চেয়ে বললেন, “এখন কি করা কর্তব্য? রাজ্যের সমস্ত সামন্ত সর্দারই উপস্থিত আছেন; আমার ইচ্ছা, এই সভাতেই সিংহাসন স্মৃজন বাহাদুরের কি হাধিরের এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হোক। আমি বুঝেছি, আমি আর অধিক দিন নয়; অতএব আমি বেঁচে থাকতেই উপযুক্ত কোনো এক কুমারের হাতে দেওয়ানীর ভার দিতে চাই। এখন দুই কুমারের মধ্যে কে উপযুক্ত তোমরা সকলে স্থির কর।”

রাজসভায় তুমুল তর্ক উঠল। সেই সময় পেট মোটা, নেশায় ঢুলু ঢুলু রক্তচক্ষু স্মৃজনসিংহ সভায় প্রবেশ করলেন। সভায় দুইদল হল। একদল বললেন স্মৃজন বাহাদুরেরই সিংহাসন পাওয়া উচিত, কেননা রাজ্য চালাতে বাহুবলের প্রয়োজন, এবং বাহুবলটা যে স্মৃজন বাহাদুরের যথেষ্ট আছে সেটা সকলেই জানে। অন্য দল ব'লে উঠল, শুধু কি বাহুবলের কর্ম। রাজ্য



চালাতে হলে ধৈর্য চাই, বুদ্ধি চাই, সূজন বাহাদুরের এ ছটোর একটাও নেই। সৈন্তই রাজার বল, রাজাকে যদি নিজের লড়াই করতে হল তবে আমরা আছি কি করতে? আমরা তো বলি হাঙ্গিরকেই রাজা করা উচিত। অস্ত্র দল বলে উঠল, বাপুহে, যে দিনকাল পড়েছে, তাতে মুকুট মাথায় দিয়ে সিংহাসনে বসে থাকলে আর চলছে না; এখন রীতিমত লড়াই করতে হবে। আমরা এমন রাজা চাই, যে একাই একশ, পাঠান ঠেকাতে পারে। দুইদলে প্রচণ্ড তর্ক, শেষ হাতাহাতি হবার যোগাড়! অজয়সিংহ বললেন, “তোমরা স্থির হও, আমি যা বলি শোন। তোমরা তো জান ভীল-সর্দার মুঞ্জ সেদিন কেলা লুট করে গেছে আমাদের সাধ্য হয়নি যে তাদের বাধা দিই। সেদিন রাত্রে ডাকাত এই কেলা থেকে চিতোরের রাজমুকুট নিয়ে পলায়ন করেছে। শুধু তাই নয়, আমি সংবাদ পেয়েছি সে নাকি আবার সেই রাজমুকুট মাথায় দিয়ে নিজেকে রাজস্থানের রাজা বলে প্রচার করেছে। সূর্যবংশের এই ঘোর অপমানের একমাত্র প্রতিকার, সেই রাজমুকুট উদ্ধার করা। হাঙ্গির আর সূজন দুজনেই এখন উপযুক্ত। দুজনের মধ্যে যিনি সেই পাপাত্মার মুণ্ড সমেত মুকুট উদ্ধার করতে পারেন তিনিই রাজ্যের অধিকারী হউন। কৃতব্র ভীল যে মাথায় মেবারের রাজমুকুট ধারণ করতে সাহসী হয়েছে, সে মাথা শীঘ্র আমি চাই, নচেৎ আমার জীবনে মরণেও শান্তি নাই। মেবারের দুই উপযুক্ত রাজকুমার বর্তমান থাকতে যদি সে মুকুট উদ্ধার না হয়, তবে জানলেম মেবারের সূর্যবংশ আজ নির্বংশ হয়েছে; রাজ্যে বীর নাই, রাজ-সিংহাসন ভীল আর পাঠানের পাওয়াই শ্রেয়। কেলায় যত সৈন্ত যত অস্ত্র আছে, দুই কুমার ইচ্ছামত ব্যবহার করুন। আজ সভা ভঙ্গ কর।” তুমুল কোলাহলে রাজসভা ভঙ্গ হল।

তার পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বন্ধু-বান্ধব সৈন্ত-সামন্ত নিয়ে সূজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে চললেন। আজ তিনি ভারি ব্যস্ত। অগ্নদিন

বেলা এগারটার পূর্বে স্নান বাহাদুরের ঘুম ছাড়ত না, আজ তিনি ভোর না হতেই প্রস্তুত। এত ব্যস্ত যে হাঙ্গিরকে সঙ্গে ডেকে নিয়ে যান তারও সময় হল না। কেয়ার জনপ্রাণী না উঠতে উঠতে বড় কুমার স্নান-সিংহ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দু-একজন সামস্ত জিজ্ঞাসা করলেন “কই, ছোট কুমার গেলেন না ?”

স্নানসিংহ হেসে বললেন, “তিনি এখন একটু আরাম করছেন। চল আমরা আগে যাই ; তিনি আহারাদি করে পরে আসবেন এখন।”

অমনি একজন খোসামুদে রাজপরিষদ বলে উঠল, “চলুন আমরা আগে তো গিরে ডাকাতদের বাসা ঘেরাও করি, পরে না হয় ছোট কুমার এসে তার মুণ্ডটা কেটে নিয়ে যাবেন।” অন্য জন বা বললে “হাঁঃ, রানার বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে। একি যার তার কর্ম ? বুকের পাটা চাই। ডাকাত বলে ডাকাত—মুঞ্জ ডাকাত ! নামে যার দেশ শুদ্ধ ধরহরি কম্প, তাকে ধরতে কিনা ছোট কুমার ! হাতি মারতে পতঙ্গ !” ওর মধ্যে কোনো এক মন্ত্রিপুত্র বলে উঠল, “না হে না, রাজবুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কি তোমাদের কর্ম ! কণ্টক দিয়ে কণ্টক উদ্ধার, বুঝলে কিনা !”

স্নানসিংহ হেসে বললেন, “না হে না, তোমরা জান না, হাঙ্গিরের গায়ে বেশ শক্তি আছে। তবে কি জান, ছেলেমানুষ, এখনও হাড় পাকে নি। আমি এবার লড়াই থেকে এসেই তাকে রীতিমত কুস্তি শেখাবার বন্দোবস্ত করছিঃ দেখনা !”

এদিকে সকালে উঠে হাঙ্গির একখানা পুরানো তলোয়ার আর একখানা ছোরা শান-পাথরে ঘসে ঘসে সাফ করছিলেন। ছোরাখানা পিতা অরিসিংহের, আর তলোয়ারখানা উজলা গ্রামের দাদামশায় হাঙ্গিরকে দিয়ে গিয়েছিলেন। আজ কতকাল পরে শান পেয়ে অস্তর দুখানা বর্ষার জল পেয়ে নদীর স্রোতের মতো ক্রমে খরধার হয়ে উঠল। হাঙ্গির বসে বসে অস্তরে শান দিচ্ছেন, এমন সময় লছমীরানী সেখানে এসে বললেন,

“এখানে বসে কি করছিস্ ?”

হাষির বললেন, “জানো না মা ? ডাকাত ধরতে যেতে হবে, তাই অস্তর দুখানায় শান্ দিয়ে নিচ্ছি।”

লছমীরানী বললেন, “হা কপাল ! তুমি এখনও অস্তর শান্ দিচ্ছ, আর ওদিকে যে স্জজনসিং সৈন্তসামন্ত নিয়ে ডাকাত ধরতে গেল। তোর চেয়ে তো সে কাজের লোক দেখি ; লোকে কেবল তার মিছে দুর্নাম রটার বুঝলেম।”

হাষির যেন মায়ের কথায় একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন, “তাই তো মা, দাদা তো আমায় ডেকে গেলেন না ? রাজত্বটা দেখছি আমার কপালে নেই। যাই হোক, আমি ছাড়চিনে।”

এই কথা বলে হাষির দ্বিগুণ উৎসাহে তলোয়ার শান্ দিতে লাগলেন।

রানীমা বললেন, “যা যা, বেলা হল—এখন কিছু খেয়ে আয়, আমি ততক্ষণ এ দুখানায় শান্ দিচ্ছি।”

হাষির উঠে গেলেন, আর লছমীরানী বসে বসে অস্তরে শান্ দিতে লাগলেন। রাজপুতের মেয়ে বাটনা বাটা কুটনো কোটার চেয়ে অস্তরে শান্ দেওয়া ভালো বোঝেন। তাঁর হাতে পড়ে অস্তর দুখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই চক্চকে ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠল। হাষির ফিরে এলে রানীমা তাঁর হাতে ছোরাখানা দিয়ে বললেন, “দেখ দেখি, এটায যেন ফাট ধরেছে বোধ হয়। আঁকা বাঁকা যেন কিসের দাগ দেখছি ! এ খানায় তো কোনো কাজই হবে না।”

হাষির বললেন, “বল কি মা, বাবার হাতের ছোরা কাজে লাগবে না কি ? দাও দেখি একবার ভালো ক’রে দেখি।” হাষির ছোরাখানা নিয়ে এদিক ওদিক ফিরিয়ে দেখলেন, কিছু বোঝা গেল না। মনে হল যেন ছোরার ফলকটার একদিক থেকে আর একদিক জুড়ে একটা আঁকা-বাঁকা ফাট। ফাট কি রক্তের দাগ চেনা যায় না !

হাষির বললেন, “তাই তো, এটা তো কিছু বোঝা গেল না ; ভালো ক’রে দেখতে হবে। যা তুমি অন্তর কুখানা আমার ঘরে রেখে দিও। আমি একবার মহারাজার সঙ্গে দেখা ক’রে আসি, একটা ভালো ঘোড়া দেখে নিতে হবে।”

অজয়সিংহ আজ আর সভায় যাননি। শরীর অসুস্থ, নিজের মহলে বিশ্রাম করছিলেন ; হাষিরকে আসতে দেখে বললেন, “সে কি, তুমি যাওনি ? সূজন তো অনেকক্ষণ রওনা হয়েছেন।”

হাষির বললেন, “আজ্ঞে, একটা ঘোড়া বেছে নিতে কিছু বিলম্ব হবে, আমি আজ সন্ধ্যাকালেই রওনা হব।”

অজয়সিংহ বললেন, “লোকজন তো সব বড় কুমারের সঙ্গে চলে গেছে, তুমি একা পথ চিনবে কেমন ক’রে ?”

হাষির বললেন, “আজ্ঞে একজন শিকারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি, সে-ই আমাকে ডাকাতির আড্ডা দেখিয়ে দেবে। আমি মনে করেছিলাম, লোকজন নিয়েই যাব, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, মুঞ্জ ভীল যে রকম দুর্দান্ত, তার সঙ্গে লোকজন নিয়ে পেরে ওঠা অসম্ভব। কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা চাই।

অজয়সিংহ বললেন, “যা ভালো বোঝ তাই কর। আশীর্বাদ করি জয়ী হও।” হাষির প্রণাম ক’রে বিদায় হলেন।

হাষির নিজের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন লছমীরানী এসে বললেন, “কই তোর যাবার কি হল ? তোর তো লড়ায়ে যাবার কোনো চেষ্টাই নেই দেখছি। ভয় পেলি না কি ? এই যে বললি, ঘোড়া ঠিক করতে যাচ্ছি, আর ঘরে এসে ঘুম দিচ্ছি ?”

হাষির একটুখানি হেসে বললেন, “রোসো মা, ডাকাত ধরতে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার ? একটু ভেবে নিতে দাও, ফন্দি আঁটতে দাও ! একি বুনো শূয়োর, যে যাব আর জনারের শিবে গঁথে আনব।”

লক্ষ্মীরানী বুঝলেন, হাথির মুখে ভামাসা করছেন, কিন্তু মনে মনে যেন কি একটা মতলব স্থির ক'রে বসে আছেন। তিনি হাথিরের দিকে চেয়ে বললেন, “বটে, আমার সঙ্গে ভামাসা হচ্ছে ? একটা জনারের শিষ দিয়ে বুনো শূরোর গেঁথে আন, তবে বাহাদুর বুঝি। দেখা যাবে তোমার ঐ পুরোনো তলোয়ার আর দাগী ছোঁরায় কতদূর কি কর। এখন বল দেখি তোঁর মতলব কি ?”

তারপর মায়েতে ছেলেতে সেই নির্জন ঘরে সারাদিন কত কি পরামর্শ হল। সন্ধ্যা হয় হয়, রানী লক্ষ্মী বললেন, “তুই-তবে প্রস্তুত হ'—আর বিলম্ব করলে রাত্রি হয়ে পড়বে।”

হাথির বললেন, “আর প্রস্তুত কি, এই যেমন আছি, তেমনিই যাব। দেখতো মা, আমার ঘোড়াটা এল কি না।”

রানী উঠে গেলেন। হাথিরের ঘোড়া প্রস্তুত হয়ে এল। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, “দেখা যাক মা, পুরোনো তলোয়ার, দাগী ছোঁরা আর এই বেতো ঘোড়াটা নিয়ে কতদূর কি করতে পারি।”

মা আশীর্বাদ করলেন, “জয়ী হও।”

হাথির সেকেলে তলোয়ার কোমরে গুঁজে সামান্য বেশে সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে এল। সূর্য অস্ত গেলেন। হাথিরকে নিয়ে সেই বেতো ঘোড়া খটর্ খটর্ ক'রে গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথে প্রবেশ করলে।

আরাবল্লী পর্বতের নিবিড় বনচ্ছায়ায় ঘোর অন্ধকার। দুহাত তফাতে লোক চেনা যায় না। হাথির তাঁর বেতো ঘোড়াটাকে একদিকে ছেড়ে দিয়ে কালো কঙ্কল মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে সেই বনের অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লেন। ছায়ার সঙ্গে যেন একটা ছায়া মিলিয়ে গেল। যেমন শিকারের সন্ধানে বাঘ ফেরে তেমনি সেই অন্ধকার বনে হাথির নিঃশব্দে অতি সস্তূর্ণনে গিরি-নদীর পারে পারে, ঘন বনের ধারে ধারে পাহাড়ের গহ্বরে

গহ্বরে ডাকাতির সন্ধান ক'রে চললেন। তৃষ্ণার সময় নদীর জল, ক্ষুধার সময় গাছের ফল, ঘুমের সময় পর্বতের গহ্বর, এমনি ক'রে হাথিরের দিন কেটে চলল। যে সব মহাবনে মানুষের চলাচল নেই—দিবারাত্রি যেখানে কেবল সবুজ অন্ধকার আর বাঘ-ভালুকের গর্জনে পরিপূর্ণ, দিনের পর দিন হাথির সেই সব মহাবনের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; বনের আর অস্ত নেই।

একদিন ঘোর অমাবস্যার রাত্রি—বনের ভিতর দিয়ে পথ দেখে চলা অসম্ভব, হাথির একটা প্রকাণ্ড শালগাছে চড়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছেন আর মনে মনে ভাবছেন, দূর কর ছাই, ডাকাতির সন্ধান কি পাওয়া যাবে না? আজ তো এই অন্ধকারে আর পথ চলা অসম্ভব। আজ রাত্রি দেখছি এই গাছেই কাটাতে হল। উঃ, বনের তলায় মশাগুলো ভন্ ভন্ ক'রে ডাকছে দেখ। আবার ঐ যে বাঘের গর্জন ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে। এত মশার ভন্ভনানি আর বাঘের গর্জন কোনো দিন তো শুনিনি। যাই হোক আজ রাত্রিতে আর মাটিতে পা দেওয়া নয়। এ বনটার তত গাছপালা নেই কিন্তু জীব-জন্তু দেখছি অনেক আছে। হাথির নিজেকে বেশ ক'রে গাছের সঙ্গে বেঁধে নিদ্রা গেলেন।

অনেক রাত্রে হাথিরের ঘুম ভাঙল। হাথির দেখলেন আকাশের একদিকে রাঙা আলো দেখা দিয়েছে। সকাল হয়েছে ভেবে হাথির উঠে বসলেন; কিন্তু সকাল হলে তো পাখী ডাকে না কেন? তবে ভ্রম হল নাকি? হাথির বেশ ক'রে চারিদিক দেখতে লাগলেন। সেই সময় যেন ছুজন মানুষে সেই শালগাছের তলায় কথা কইছে শোনা গেল। লোক দুটোর কথা বোঝা গেল না, কিন্তু দু-একবার মঞ্জু ডাকাতির আর পুজন বাহাদুরের নাম বেশ স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

হাথির আস্তে আস্তে গাছের ডাল বেয়ে খানিকটা নেবে এসে কান পেতে শুনতে লাগলেন, দুই পাহাড়িতে কথা হচ্ছে, “ওরে ভাই

বদরী, তুই এখনও সর্দারকে মুঞ্জ মুঞ্জ বলিস, তাইতো সে চটে যায়।”  
“মুঞ্জকে মুঞ্জ বলব না তো কি ? সে কি জানেনা যে আমি তার চাচা  
হলেম ?”

“ওরে ভাই, সে কি এখনও চাচা ফাচা মানে ? যে দিন থেকে সে  
সেই রাজপুতগুলোকে আর রানার ছেলেকে লড়ায় হারিয়ে দিয়েছে,  
সেইদিন থেকে তার মাথা বিগড়ে গেছে। সে এখন চায়, আমরা তাকে  
রানা আর তার ছেলেকে কুমার বলি।”

“রেখে দে তোর রানা, রেখে দে তোর কুমার। আমি তাদের চিরকাল  
বলব মুঞ্জ আর ভুঞ্জ।”

“তবে ভাই রঞ্জু, আজ তুই লাচ দেখতে চলেছিস কেন ? সর্দার আজ  
মেয়ের বিয়েতে মৌয়া খেয়ে নেশা করেছে—তাকে দেখলেই মাথা  
কাটতে আসবে।”

“ওরে একি বলিদানের মোষ পেয়েছিস যে টক্ ক’রে হাড়িকাঠে মাথা  
দেবে ? চল এখন নাতনীর বিয়েতে একটু আমোদ করা যাক ; বাজে  
কথায় কেবল রাত কাটালি।”

লোক দুটো হন্ হন্ ক’রে উত্তর মুখো চলল। হাঙ্গির এতক্ষণে বুঝলেন,  
তিনি ডাকাতের আড্ডায় এসে পড়েছেন। দূর থেকে মাদল আর ঝাঁঝের  
হম্ হম্ ঝুমঝুম্ আওয়াজ অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মশালের আলো  
আকাশের একদিক রাঙা ক’রে তুলেছে। হাঙ্গির তাড়াতাড়ি গাছ থেকে  
নেমে সেই লোক দুটোর সঙ্গ নিলেন।

কতদিন কেটে গেছে, পুজন বাহাদুর ডাকাত ধরতে না পেরে কৈলোরের  
কেল্লায় ফিরে এসেছেন। হাঙ্গিরের কিঙ্ক কোন খবর নেই। সকলেই  
বলছে, নিশ্চয়ই তিনি ডাকাতের হাতে কাটা পড়েছেন। এমন সময় এক-  
দিন মহারানার সভায় হাঙ্গিরের এক পত্র এল। হাঙ্গির উজলা গ্রাম থেকে  
লিখছেন—তিনি উজলা গ্রামে মুঞ্জ বাহাদুরকে মেবারের রানা ক’রে

রাজসিংহাসন দিয়েছেন। নতুন রানা হাশিরকে কৈলোরের কেল্লা আর একশ'খানা গ্রাম জায়গীর দিয়েছেন। অজয়সিংহ যদি সহজে কেল্লা ছেড়ে দেন তো ভালো, নচেৎ লড়াই নিশ্চয়! এবং মুজবাহাদুর শরীরে সগণে এসে কেল্লা দখল করবেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাস্তি।

শুনে মুজবাহাদুর বলে উঠলেন, “দেখলে, ছোকরার কাণ্ডটা দেখলে একবার। সে কি মনে করেছে, দুই মুঠো ডাকাতে দল নিয়ে মেবারের সিংহাসন দখল করবে? এত বড় তার স্পর্ধা।”

অজয়সিংহ বললেন, “হাশির কি এতদূর নীচ হবে? এতো আমার বিশ্বাস হয় না। চিঠিটা কেমন কেমন শোনাচ্ছে না?”

রাজমন্ত্রী বললেন, “কথাটা যদিও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু বলাও যায় না। আমার মনে হয় প্রস্তুত হয়ে থাকাই ভালো। আজকালের ছেলে, কখন কি করে বসে বলা যায় না।”

মুজবাহাদুর বললেন, “তবে একবার মেবারের সমস্ত সামন্ত-সর্দারকে খবর পাঠানো যাক।”

অজয়সিংহ বললেন, “তাতে কাজ নেই। এ কি পাঠান বাদশা আসছে, যে সামন্ত-সর্দারদের খবর পাঠাতে হবে? লোকে যে হাসবে! সকলকে সাবধানে থাকতে বল? হঠাৎ না কেল্লায় ডাকাতি হয়। হাশিরকে লিখে দাও, সে যেন এমন দুঃসাহসের কাজ না করে। আর একদল সৈন্য নিয়ে তুমি উজলা গ্রাম থেকে ডাকাতে দল তাড়িয়ে দাও গে; আর পার তো হাশিরকে বেঁধে আন।”

মুজবাহাদুর “যে আজ্ঞে” বলে উঠে গেলেন। কিন্তু তিনি মুজবাহাদুর ডাকাতে হাতে একবার পড়েছিলেন। সে যে কেমন সহজ ডাকাত, বেশ চিনেছেন। ঘরে গিয়েই রাজবৈশ্যকে দিয়ে মহারানাকে বলে পাঠালেন, শরীর তাঁর বড় অসুস্থ; কিছুদিন বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হয়। ডাকাত ধরতে সেনাপতিকে পাঠালে চলে না?



অজয়সিংহ বললেন, “আচ্ছা তাই হবে।”

সেদিন রাতে অজয়সিংহ লছমীরানীর সঙ্গে দেখা করে হাষিরের পত্র দেখালেন। রানীর অন্তর-মহলে সেনাপতির তলব হল। তারপর হাষিরের নামে চিঠি নিয়ে সেনাপতি বিদায় হলেন। তাঁর উপর হুকুম রইল—হাষিরের পরামর্শ মতো খুব সাবধানে কাজ করবে।

এদিকে উজলা গ্রামে শেয়ালরাজার মতো মুঞ্জবাহাদুর রাজসিংহাসন আলো করে বিরাজ করছেন। ডাইনে বামে গম্ভীরমল আর চুরোমল দুই নতুন মন্ত্রী কানে কানে গুঞ্জে বসে আছেন। আর রাজসভায় আছেন হাষির আর উজলাগ্রামের দু'এক পেট-মোটা জোতদার আর দু'চার কালো মুস্কো পাহাড়ি ভীল।

একজন গরীব প্রজা খাজনা দিতে পারেনি, রাজার লোকে তাকে বেঁধে এনেছে। মুঞ্জরাজা হুকুম দিলেন, “ওর মাথা কাট।” অমনি হাষির কানে কানে বললেন, “এরকম করলে প্রজালোক খাপ্পা হবে। ওকে কিছু বখশিষ দিতে হুকুম হোক।” অমনি দুই মোহর ইনাম হয়ে গেল, গরীব প্রজা দুই হাতে সেলাম ঠুকে বিদায় হল। মনে মনে বললে, “রাজা তো হাষির, এটা তো ডাকাতির সর্দার, ওর কি দয়া-মায়া আছে?”

এই সময় কৈলোরের কেলা থেকে সেনাপতি এসে মুঞ্জ বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা স্থির হল—মহারানা কৈলোরের কেলা হাষিরকে দিয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে কাশী বাস করুন, তাঁর খরচ-পত্র রাজভাণ্ডার থেকে দেওয়া হোক, আর হাষির ভীল-রাজার মন্ত্রী হয়ে রাজ্যশাসন করুন; সে জগ্রে তাঁকে সমস্ত খরচ-খরচা ও মাসিক ছয় হাজার তনুখা ও চিতোরের কেলা জায়গীর দেওয়াই স্থির।

গম্ভীরমল সর্ত আওড়ালেন, চুরোমল একরারনামা লিখে হুজুরে পেশ করলেন, কিন্তু হুজুর তো পড়তে জানেন কত—কলম হাতে হাষিরের দিকে চাইলেন।

হাশির বললেন, “এ সব পাকা দলিলে কলমের গই দেওয়া ভালো নয় । আমি বলি, মহারাজ এতে পাঞ্জা মোহর ক’রে দিলেই ভালো হয় ।”

যুগ্মবাহাদুর দুই হাতে কালি মেখে দলিলের দুই পিঠে হাতের ছাপ লাগালেন । সেনাপতি দলিল নিয়ে বিদায় হলেন । যুগ্মবাহাদুর হাশিরের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললেন, “এ তো বড় মজা । ‘লড়াই’ নেই, হান্ধামা নেই, এক হাতের ছাপেই কাজ সাফ ? দিল্লীর বাদশাকে এমনি একটা পাঞ্জা পাঠিয়ে চিতোরের কেলাটা দখল নিলে হয় না ?”

হাশির বললেন, “আগে মেবার দখল ক’রে নেওয়া যাক, তারপর দিল্লী পর্যন্ত ঠেলে যাওয়া যাবে । এখন একটু আমোদ আহ্লাদের হুকুম হোক । রানার সেনাপতি আমাদের জাঁক-জমকটা একবার দেখে যাক ।”

যুগ্মরাজা বললেন, “বন্ধু, তুমি যেমন ভালো বোঝা কর, কিন্তু দেখ, মাদলের বাজনা আর মহরার কলসীটা ভুলো না । এ দুটো না থাকলে আমোদ হবে না ।”

হাশির ভারে ভারে মহরার কলসী, দলে দলে মাদলের ব্যবস্থা করলেন । উজলাগ্রামে ভীলরাজার রাজপ্রাসাদে আমোদের ফোয়ারা খুলে গেল । সেনাপতি এলেন, গম্ভীরমল এলেন, চুয়ামল এলেন, হাশির এলেন, গ্রামের প্রজালোক পাড়া-প্রতিবাসী যে যেখানে ছিল, সকলে এল । আর সেই সঙ্গে এল শাদা কাপড়ে ভদ্রলোক সঙ্গে একদল রাজপুত্র সৈন্য !

রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে, গ্রামবাসীরা যে-যার ঘরে ফিরেছে ; ভীলের দল মহরার কলসী খালি ক’রে যেখানে সেখানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, সেই সময় হাশির তাঁর বেতো ঘোড়ার পিঠে একটা রক্ত-মাখা চটের বলি চাপিয়ে উজলা গ্রাম থেকে বিদায় হলেন । সেনাপতির উপর ভীল-রাজার রাজপ্রাসাদ জ্বালিয়ে দেবার হুকুম রইল ।

হাশির যেমন সন্ধ্যাবেলায় বেতো ঘোড়ায় চড়ে কৈলোরের কেলা থেকে বেরিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি সন্ধ্যাবেলা সেই বেতো ঘোড়ায় চড়ে কতদিন

পরে রাজমুকুট সমেত মুঞ্জ ডাকাতের মুণ্ড নিয়ে ফিরে এলেন। কেহ্নায় জয়জয়কার পড়ে গেল !

মহারানা সেই ভীলের কাঁচা রক্তে হাথিরের কপালে রাজটিকা লিখে দিয়ে বললেন, “রাজপুতের নিয়ম সিংহাসনে বসবার আগে টিকাজের ব্রত সঙ্গ করতে হয়। আজ এই শত্রুর রক্তে তোমার সেই ব্রত উদ্ঘাপন হল। আজ থেকে সিংহাসন তোমার, রাজমুকুট তোমার। কিন্তু মনে রেখ, মেবারের মুকুট উদ্ধার হল বটে, রাজ্য এখনও পাঠানের হস্তগত।” তারপরে মহারানা সূজনসিংহকে ডেকে পাঁচ হাতিয়ার আর এক ঘোড়া দিয়ে বললেন, “তুমি মেবার ছেড়ে দক্ষিণ দেশে যাও। সেখানে তোমার ক্ষমতা থাকে তো নতুন রাজত্ব কর গিয়ে। মনে ভেবনা যে তোমাকে আমি স্নেহ করি না; কিন্তু আমি বেশ বুঝছি, তোমার নির্বাসনে মেবারের মঙ্গল, তোমারও মঙ্গল। আর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে তোমার সন্তানেরা একদিন দক্ষিণ দেশে অথবা রাজ্য বিস্তার করবে। যাও, মনে রেখ তুমি সূর্যবংশের সন্তান. তোমা-হতে যেন সে বংশের কলঙ্ক না হয়। নিজের উপর নির্ভর কর, তবেই বড় হতে পারবে।”







হামিদের বাঙলাড



হাঙ্গির এখন আর শুধু হাঙ্গির নয়—ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান মহারানা হাঙ্গির ! নামটা শুনতে যতখানি, হাঙ্গিরের রাজত্ব কিন্তু ততখানি ছিলনা । থাকবার মধ্যে কৈলোরের কেল্লা, তার আশে পাশে খানকতক গ্রাম আর দুই হাজার মাত্র রাজপুত সেপাই । মেবারের মহারানা এখন ঠিক যেন একজন তালুকদার ।

এদিকে দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলিজীর হয়ে মালদেব তখন চিত্তোরে বসে সমস্ত মেবার শাসন করছিলেন ।

চিত্তোর থেকে প্রায় বিশকোশ দূরে কৈলোরের কেল্লা । কোনো কোনো দিন আকাশ পরিষ্কার থাকলে কৈলোর থেকে পাহাড়ের উপর চিত্তোরের কেল্লা ঠিক যেন একখানি জাহাজের মতো আকাশ-সমুদ্রে ভেসে রয়েছে দেখা যেত ।

হাঙ্গির লক্ষ্মী মায়ের সঙ্গে কেল্লার ছাদে উঠে, লোক যেমন ঠাকুর দর্শন করে তেমনি—চিত্তোর দর্শন করতেন । সেই সময় সূর্যের আলোয় সকালবেলায় সোনার আকাশ-পটে রাজপ্রাসাদের পাথরের দেওয়াল দেব-মন্দিরের সোনার চূড়া নিয়ে পাহাড়ের উপরে চিত্তোরের কেল্লা ধীরে ধীরে ফুটে উঠত । হাঙ্গির বলতেন, “ওই দেখ মা, আমার জাহাজ দেখা দিয়েছে ।”

রাণীমা বলতেন, “জাহাজ তো তৈরী আছে । তুই যদি ঘুম দিতে থাকিস্ তবে জাহাজ যে বেদখল হয় ।”

হাঙ্গির বলতেন, “এ জাহাজ মারে কার সাধ্য ।”

হাঙ্গির যে ঘুম দিচ্ছিলেন না একথা লক্ষ্মীরানী অতি অল্প দিনেই জানতে পারলেন । সেদিন দেওয়ালির পূজা । সন্ধ্যাবেলা হাঙ্গির এসে মাকে বললেন, “মা’ দেওয়ালির আলো দেখবে তো ছাদে এস ।”

রাণীমা হেসে বললেন, “আচ্ছা তুই এত বড় হলি তবু মায়ের সঙ্গে তামাসা করা রোগট’ তোর এখনও গেল না ? এই মাঠের মধ্যে

দেওয়ালির আলো কোথায় পেলি ? এ কি তোর চিতোর—যে ঘরে ঘরে  
লোকে আলো দেবে ?”

“দেখবে এস না মা ব’লে হাঙ্গির লছমীরানীকে নিয়ে কেঁলার ছাদে  
উঠলেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যা—কিন্তু আকাশ ছেয়ে তারা ফুটে-  
ছিল ; যেন দেবতারা ফুল ছড়িয়ে গেছেন ! রানীমা অবাক হয়ে আকাশের  
দিকে চেয়ে আছেন।

হাঙ্গির হেসে বললেন “মা, কি চমৎকার বাহার দেখেছ ! কিন্তু এ  
দেওয়ালি তো দেবতাদের—তোমারও নয়, আমারও নয়। এখন একবার  
কৈলোরের দেওয়ালি—আমার দেওয়ালিরই আলোটা কেমন হয়েছে  
এদিকে দেখ দেখি !”

রানীমা চেয়ে চেয়ে দেখলেন—কৈলোরের কেঁলার চারিদিকে পাহাড়ে  
পাহাড়ে আলো জ্বলছে ! গ্রামের পথে মাঠে ঘাটে দিকে দিকে লক্ষ লক্ষ  
প্রদীপ, যেন তারার মালা, আলোর জাল ! লছমীরানী অবাক হয়ে  
হাঙ্গিরের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, “এই জনমানবহীন কৈলোরে  
এত আলো, এত লোক কোথা থেকে এল ?”

হাঙ্গির বললেন, “ওই যে পাহাড়ের দিকে দেখছ ওই আলো সব ভীলেরা  
জ্বালিয়েছে। আর যে গ্রামের দিকে দেখছ এসব গ্রামবাসীদের দেওয়া।”

রানীমা বললেন, “এত প্রদীপ, এত তেল, তুই এসব বুঝি চিতোর থেকে  
আমদানি করলি ?”

হাঙ্গির বললেন, “শুধু চিতোর থেকে নয়, সমস্ত মেবার থেকে শুধু  
প্রদীপ আর তেল, প্রদীপ গড়বার কুমোর, তেল যোগাবার তেলিও  
আমদানি করেছি। ওই দেখ, কুমোর-পাড়ায় মশাল জ্বলছে ; যাত্রা শুরু  
হল। ওই শোন তামুলি-পাড়ায় ঢোল বাজছে ; এখনি সঙ বার হবে।  
ওই যে মহাজন পটিতে নহবৎ বাজল, তোপখানায় বোমা ফাটল। দেখছ  
মা, হাঙ্গিরতামাও ঘিরে ব্রাহ্মণের মেয়েরা কেমন প্রদীপ দিয়েছেন !”



লক্ষ্মীরানী ব'লে উঠলেন, “কি আশ্চর্য ! এ যে নগর বসিয়ে ফেলেছিস্ দেখি ! আমি বলি বুঝি তুই বসে বসে কেবল ঘুম দিস্ । ভিতরে ভিতরে তোর এত বুদ্ধি !”

হাঙ্গির বললেন, “তা যাই হোক মা, এখন আমার এই নগরের একটি ভালো নাম তোমায় বেছে দিতে হবে । লক্ষ্মীপুর কেমন নাম ?”

রানীমা বললেন, “আরে না না, ও যে বাঙালি রকম শোনাচ্ছে । আমি একটা ভালো নাম সন্ধান করছি । শুধু নাম নয়, তার সঙ্গে একটি লক্ষ্মী বউ । তুই আর দিন-কতক সবুর কর ।”

দুজনে যখন এই কথা হচ্ছে, সেই সময় চিতোর থেকে মালদেবের দূত আর একজন ব্রাহ্মণ হাঙ্গিরের বিয়ের সহক নিয়ে কৈলোরে উপস্থিত হল । ব্রাহ্মণ এসে মালদেবের চিঠি আর একটি রূপোর পাতে মোড়া নারিকেল এনে লক্ষ্মীরানীর সম্মুখে ধরে দিলেন ।

রানী চিঠিখানি খুলে পড়তে লাগলেন, লেখা রয়েছে—“আমার কন্যা কমলা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী । তাকে আপনার চরণে দাসী ক'রে আমার কুলকে পবিত্র করুন । আমি পাঠানের আশ্রয়ে আছি বটে, কিন্তু ধর্ম ছাড়িনি ।”

রানী হাঙ্গিরের দিকে চেয়ে বললেন, “দেখ দেখি, মালদেব চিতোর থেকে কেমন স্নান্নর নারিকেলটি পাঠিয়েছেন । এটা আজ দেওয়ালি পূজোর কাজে লাগবে ।”

হাঙ্গির বললেন, “বেশ ফলটি, কিন্তু মা, এটার উপর প্রথম থেকেই আমার লোভ পড়েছে । এটা আর দেবতাদের দিয়ে কাজ নেই, এটা আমাকেই দাও ।”

রানী হেসে বললেন, “তা বেশ তোমাকেই দেওয়া গেল—রাজাও একরকম দেবতা তো । কিন্তু শুধু ফলটি নিলে তো চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই চিঠিখানি আর এখানি যে লিখেছে তার মেয়েটিকেও তোমায় নিতে

হচ্ছে । যাও, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে এই চিঠির একটা ভালো ক'রে জবাব লিখে নিয়ে এস ; আমি ততক্ষণ পূজো সেবে আসি ।”

রাণী পূজায় গেলেন । হাধির ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ব্যাপারখানা কি বল দেখি ?”

ব্রাহ্মণ বললেন, “মহারানা, সভায় চলুন, সমস্ত খুলে বলব ।”

বিয়ের সমস্ত ঠিক ঠাক ক'রে মালদেবের দূত চিত্তোরে ফিরে গেল । এদিকে কৈলোরে বরযাত্রার উদ্ভোগ চলতে লাগল । যত বুড়ো বুড়ো রাজপুত্র সর্দার লছমীরানীকে ধরে বসলেন—“মালদেব হাজার হোক শত্রুপক্ষ তো বটে । মহারানাকে সেখানে বিনা পাহারায় পাঠানো কোনো মতেই উচিত নয় ।” রাণীর হুকুমে পাঁচ শ' রাজপুত্র সেপাই বরযাত্রীর সঙ্গে যাবার জন্তে প্রস্তুত হল । হাধির মাকে প্রণাম ক'রে বিদায় হলেন । লছমীরানী আশীর্বাদ করলেন, “বৎস, মালদেবের কণ্ঠার সঙ্গে মেবারের রাজলক্ষ্মীও তোমায় বরণ করুন ।” কৈলোর থেকে চিত্তোর অনেক দূর ; কিন্তু হাধিরের ঘোড়া যেন উড়ে চলল !

বরযাত্রীরা যখন চিত্তোরের সম্মুখে উপস্থিত হলেন তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে । পশ্চিমের আলোয় আকাশ ছেয়ে গেছে । ঠিক যেন দেবদূতেরা মহারানার মাথায় ছাতা ধরেছেন ।

কিন্তু মালদেব—যাঁর কণ্ঠা আজ মেবারের অধীশ্বরী, রাজরাজেশ্বরী হতে চলেছেন তিনি কোথায় ! কেল্লার দরজায় একটিমাত্র প্রহরী মহারানাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে ছুয়ার ছেড়ে পাশে দাঁড়াল । মঙ্গল-শাখ নেই, কণ্ঠাযাত্রীর আনন্দ নেই, যেন কোনো নির্জন পুরীতে হাধির প্রবেশ করলেন ।

বুড়ো মন্ত্রী এসে হাধিরের কানের কাছে বললেন, “মহারানা, যেন কেমন কেমন ঠেকছে ! মালদেবের লক্ষণ ভালো নয় ! আমার মতে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করা উচিত হয় না ।”

হাঙ্গির বললেন, “নিজের কেলাস নিজে প্রবেশ করব, তার আবার ভয়টা কি ? চলে এস—”

সেই সময় ফটকের এক কোণ থেকে মালদেব এসে বললেন, “মহারানা, আমারও সেই আশা ছিল, আপনি নিজের ঘরে আসছেন তার জুড়ে আবার অত্যাচার বা কি, বাজনা-বাণী বা কেন ?”

মন্ত্রী বললেন, “মালদেব, তুমি কি জান না রাজপুত্রদের নিয়ম আছে বিবাহের রাতে ফুলের কেলা দখল ক’রে তবে কন্যা-কর্তার বাড়িতে বর প্রবেশ করেন ? তোমার কন্যার সখীরা সে আয়োজন করেন নি কেন ?”

মালদেব বললেন, “মন্ত্রী, আমি কন্যার পিতা বটে, কিন্তু বাড়ি আমার কোথা ? এটা যে মহারানার নিজেরই কেলা ! নিজের ঘরে নিজে মহারানা এসে প্রবেশ করছেন, সেখানে আমার কন্যার সখীরা এসে তাঁকে বাধা দিতে সাহস পাবে কেন ?”

মন্ত্রী একটু হেসে বললেন, “দেখছি বাদশাহের মজলিসে আনাগোনা ক’রে আপনার কুসংস্কার অনেকটা দূর হয়েছে। এখন চলুন, বিবাহকার্য সুসম্পন্ন করুন। লছমীরানীর হুকুম, আজ রাতেই বরকন্যা নিয়ে আমরা কৈলোরে ফিরে যাব।”

হাঙ্গিরের পিতা পিতামহ যে রাজসভায় বসে রাজত্ব করতেন, সেই ঘরে হাঙ্গিরকে নিয়ে মালদেব যখন উপস্থিত হলেন, তখন হাঙ্গিরের বুকের ভিতরটা কেমন যে করে উঠল তা বলা যায় না। তাঁর মনে হল যেন সেই প্রকাণ্ড ঘরের একধারে চিতোরের শূন্য রাজসিংহাসন ঘিরে ছায়ার মতো সব বীর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে ! তাঁদের গায়ে সোনার সাঁজোয়া, হাতে খোলা তলোয়ার, মুখে কারু কথা নেই। হাঙ্গিরের সঙ্গে যত রাজপুত্র এসেছিল সবাইকার চোক সেই সিংহাসনের দিকে ! প্রকাণ্ড ঘরের আবছায়া অন্ধকারে চিতোরের শূন্য

সিংহাসনের উপরে সোনার রাজচ্ত্র আলো পেয়ে একবার ঝলমল করছে, আবার যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে! হাষিরের সঙ্গে পাঁচ শ' রাজপুত্র সেই সিংহাসনকে নমস্কার ক'রে যেমন উঠে দাঁড়ালেন, অমনি সেই অন্ধকার ঘর যেন আলো ক'রে কমলকুমারী সখীদের সঙ্গে এসে হাষিরের গলায় পদ্মফুলের মালা দিলেন। চিতোরের রাজলক্ষ্মী এতদিন অনাথা বিধবার মতো শূণ্য রাজপুরে যেন একা ছিলেন, আজ যেন কতদিন পরে চিতোরের রাজকুমার এসে তাঁকে হাতে ধরে বরণ ক'রে নিলেন।

কতদিন পরে চিতোরের কেলায় আর একবার মঙ্গলশাঁখ বেজে উঠল! চিতোরের গড় বড়-বড় তালা-বন্ধ ঘর নিয়ে এতদিন শূণ্য পড়ে ছিল, আজ সেই শাঁখের শব্দে পাঁচ শ' রাজপুত্রের তলোয়ারের ঝন্ঝনায় আর একবার যেন লোকে লোকারণ্য বোধ হতে লাগল; যেন তার আগেকার শ্রী আবার ফিরে এল!

সেইদিন থেকে দুই বৎসর না যেতে সত্য সত্যিই হাষির এসে চিতোরের কেলা দখল ক'রে নিলেন। দিল্লীর নবাব মহম্মদ খিলিজীর কাছে এ খবর পৌঁছতে গেল মালদেবের ছেলে বনবীর। তার আশা ছিল মালদেবের পরে সেই চিতোরে বসে রাজত্ব করবে। তাই সে মহম্মদ খিলিজীর সঙ্গে পাঠান ফৌজ নিয়ে চিতোরের দিকে আসতে লাগল।

শিল্পোলীতে পাঠান বাদশা ফৌজ নিয়ে তাষু গেড়েছেন। লহমীরানীর সঙ্গে কমলকুমারী আর এক বছরের রাজকুমার ক্ষেতসিংহকে আর একবার কৈলোরের কেলায় পাঠিয়ে দিয়ে হাষির যুদ্ধে গেলেন।

বাঘ যেমন হরিণের পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি রাজপুত্রসৈন্য পাঠান ফৌজের উপর গিয়ে পড়ল। সেবারে মহম্মদ খিলিজীকে আর দিল্লীর মুখে ফিরে যেতে হল না। হাষির তাঁর দুই পায়ে শিকল দিয়ে চিতোরের কেলায় এনে তাঁকে বন্ধ করলেন। বনবীরেরও সেই

দশা। কমলকুমারীর ভাই ব'লে সে যাত্রা হাশ্বির তাকে প্রাণে না মেরে বন্দী ক'রে কৈলোরে নিয়ে উপস্থিত হলেন।

হাশ্বির থাকেন কৈলোরে, আর চিতোরে কড়া পাহারার মধ্যে থাকেন দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলিজী। এক মাস, দু মাস, তিন মাস যায় হাশ্বির আর চিতোরে যাবার নাম-গন্ধ করেন না। একদিন লছমীরানী তাঁকে ডেকে বলছেন, “তুই কি পাঠান বাদশাকে চিতোর ছেড়ে দিলি নাকি? যেখানে তোর রাজসিংহাসন, সেই চিতোর ছেড়ে কৈলোরে এসে বসে থাক। তো আর সাজে না। তোর রাজা হয়ে রাজসিংহাসনে বসবার ইচ্ছে নেই কি?”

হাশ্বির বললেন, “মা, চিতোরের সিংহাসনে বসতে হলে কি চাই তা জানো? শুধু মুঞ্জ ডাকাতে হাত থেকে চিতোরের রাজমুকুট কিংবা পাঠান ফৌজের কাছ থেকে চিতোর গড়াটা কেড়ে নিলে বাপ্পারাওর সিংহাসনে বসা যায় না। ভবানী মায়ের হাতের খাঁড়াখানি যতদিন না সন্ধান ক'রে পাওয়া যায় ততদিন তো রাজা হওয়া যাবে না। আগে সেই খাঁড়াখানির পূজা দিয়ে তবে রাজসিংহাসনে বসা চাই। সে খাঁড়া যে এখন কোথায়, তা কেউ জানে না। কেউ বলে পাঠানেরা লুটে নিয়ে গেছে, কেউ বলে রানী পদ্মিনীর সঙ্গে সে খাঁড়া চিতোর আগুনে ছাই হয়ে গেছে।”

লছমীরানী বললেন, “আমি এ ছোটো কথা একটাও বিশ্বাস করিনে। লোকে যাই বলুক, আমার বিশ্বাস ভবানীর খাঁড়া এখনও চিতোরেই আছে। কেবল চিতোরে এমন কেউ কাজের লোক নেই যে সেই খাঁড়াখানি যত্ন ক'রে সন্ধান করে। লোকেরই বা দোষ-দিই কেন? চিতোরের যে রাজা তাঁরই যখন কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না তখন সামান্য লোকের এত কি গরজ যে খাঁড়াখানা সন্ধান ক'রে তাদের রাজার হাতে তুলে দেয়!

সেই দিন হাশ্বির মায়ের পায়ে হাত দিয়ে শপথ করলেন, “ভবানীর খাঁড়া উদ্ধার ক’রে তবে অগ্র কাজ !”

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আকাশে মেঘ ক’রে একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে ; হাশ্বির ও কমলকুমারী দুজনে লুকিয়ে চিতোরের কেলায় এসেছেন ! গ্রামবাগী চাষা-চাষীর সঙ্গে, কমলকুমারী পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন আর হাশ্বির তাঁর সঙ্গে গায়ে একখানা মোটা কঞ্চল জড়িয়ে মস্ত পাগড়িতে মুখের আধখানা ঢেকে গুটি-গুটি চলেছেন বরাবর যেদিকে শ্মশান সেইদিকে । আকাশ দিয়ে কালো-কালো মেঘ ছ-ছ ক’রে পূব থেকে পশ্চিমে ছুটে চলেছে । ঝড়ের তাড়ায় বড়-বড় গাছের ডালগুলো মচ্ মচ্ ক’রে শব্দ করছে । চারদিকে ঘোর অন্ধকার, কেউ কোথাও নেই, বাতাস এমন ঠাণ্ডা যে গায়ে লাগলে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে । এই অমাবস্যার রাত্রে ঝড়ে জলে ঘোর অন্ধকারে কমলকুমারী হাশ্বিরকে নিয়ে মহাশ্মশানের ভিতরে এসে উপস্থিত হলেন । চোখে কিছু দেখা যায় না, কেবল একদিক থেকে বরাবর ক’রে একটা শব্দ আসছে—যেন অন্ধকারের ভিতরে একটা ঝরণা পড়ছে ।

যেদিক থেকে জলের শব্দ আসছিল, সেইদিক দেখিয়ে কমলারাগী হাশ্বিরকে বললেন, “ও ঝরণার ধারে পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারই পাশ দিয়ে একটা স্ফুড়ঙ্গ পাতালের দিকে নেমে গেছে ; সেই স্ফুড়ঙ্গের ভিতরে পদ্মিনীরাগী চিতার আগুনে পুড়ে মরেছিলেন । ওই স্ফুড়ঙ্গের শেষে একটা গুহায় কারুণী দেবীর মন্দির । শুনেছি সেইখানে একটা অজগর সাপ পাহারা দিচ্ছে, আর ঠিক তার মাথার উপরে ভবানীর খাঁড়া ঝুলছে । আমি অনেকবার সেই স্ফুড়ঙ্গ পর্যন্ত গেছি, কিন্তু ভিতরে যেতে সাহস হয়নি ।”

হাশ্বির বললেন, “তুমি স্ফুড়ঙ্গ পর্যন্ত আমার সঙ্গে চল ; সেই বটগাছের তলায় তোমাকে রেখে আমি ভিতরে যাব ।”

শ্মশানের একধার দিয়ে একটা আঁকা-বাঁকা স্তূড়ি-পথ অন্ধকারের দিকে  
নেমে গেছে। দুজনে সেই পথে পায়ে-পায়ে চললেন। কতদূর চলে সামনে  
একটা জলের নালা—আর রাস্তা নেই! পাথর কেটে ঝরণার জল  
কুলকুল ক’রে ছুটে চলেছে। নালার জল এক হাঁটু, কিন্তু বরফের মতো  
ঠাণ্ডা—পা রাখা যায় না!

হাশির কমলারানীকে দুই হাতে তুলে ধরে সেই জলের উপর দিয়ে হেঁটে  
সেই বটগাছের দিকে চলেছেন। শুনতে পাচ্ছেন, দূরে যেন পাহাড়ের  
ভিতর থেকে বান্বানু ক’রে একটা শব্দ আসছে! কারা যেন লোহার  
কপাট ধরে নাড়া দিচ্ছে। বটগাছের একটা শিকড় ধরে হাশির ডাঙ্গায়  
উঠলেন। সেখানটা এমন নিস্তরঙ্গ, এমন অন্ধকার যে মনে হয়, পৃথিবী  
ছেড়ে কোথাও এসেছি!

সেই বটতলায় কমলারানীকে বসিয়ে রেখে হাশির অন্ধকারে দুইহাত  
বাড়িয়ে স্তূড়ির ভেতর নেমে চললেন। হৃদিকে পাহাড়ের দেওয়াল  
বেয়ে জল পড়ছে। একটু আলো নেই, একটু শব্দ নেই, সামনে কিছু  
দেখা যাচ্ছে না, পিছনে কিছু সাড়া দিচ্ছে না। নীল অন্ধকারের ভিতর  
দিয়ে হাশির একা চলেছেন। একবার তাঁর পায়ে ঠেকে কি একটা গড়  
গড় ক’রে গড়িয়ে গেল। হাশির সেটা হাতে তুলে দেখলেন একটা মড়ার  
মাথা! কখনো তাঁর পায়ে চাপনে একখানা শুকনো মড়ার হাড় মড়মড়  
ক’রে গুঁড়িয়ে গেল। কখনো পাহাড়ের ফাটল বেয়ে একটা গাছের শিকড়  
নেমেছে, সেটা তাঁর হাতে ঠেকে মনে হল যেন সাপের গায়ে হাত  
পড়েছে; কখনো তিনি দূরে থেকে যেন ফৌস ফৌস আওয়াজ শুনতে  
পাচ্ছেন; কখনো মনে হচ্ছে কারা যেন ফিস্ ফিস্ ক’রে কথা বলছে;  
এক এক জায়গায় আলেয়া একবার দপ্ ক’রে জলেই নিবে যাচ্ছে;  
কোথাও মনে হচ্ছে পাথরের দেওয়াল কত দূরে যেন সরে গেছে; আবার  
এক-এক জায়গায় দেওয়াল যেন চেপে পড়তে চাচ্ছে! এক জায়গায়

শুনলেন মাথার উপর থেকে কাদের যেন কান্নার শব্দ আসছে ; পা যেন তাঁর ছাইগাদার বসে যেতে লাগল ; মাথার উপর হাথির চেয়ে দেখলেন অনেক দূরে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে—চারিদিকে তাঁর গোল পাথরের দেয়াল, কোনো দিকে আর যাবার পথ নেই ! সেই অন্ধকূপের ভিতর হাথির চারিদিকে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন । নিচে পথ নেই, উপরে পথ নেই, আশে পাশে পাথরের দেয়াল, তারি মাঝে স্তূপাকার ছাই, চলতে গেলে পা বসে যায় ।

কতক্ষণ হাথির সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, এমন সময় পাথরের দেয়ালের উপর থেকে শুনলেন শাঁক ঘণ্টার শব্দ আসছে ! দেখতে দেখতে হাথিরের চোখের সামনে খানিকটা পাথরের দেয়াল ছুঁকাক হয়ে সরে গেল ; সেই ফাঁক দিয়ে হাথির দেখলেন, গেরুয়া কাপড় রুদ্রাক্ষের মালা পরা পাঁচজন ভৈরবী আগুনের উপরে একখানা প্রকাণ্ড লোহার কড়া ঘিরে বসে রয়েছেন । অনেকদূরে কারুণী দেবীর সোনার মূর্তি আগুনের আলোয় ঝকঝক করছে ।

হাথির নির্ভয়ে কারুণীর মন্দিরে যেখানে ভৈরবীরা বসে রয়েছেন, সেখানে উপস্থিত হলেন ! হাথিরকে দেখে ভৈরবীরা বিকট চীৎকার করে বলে উঠলেন, “কেরে তুই ! কি চাস ?”

হাথির নির্ভয়ে বললেন, “আমি এসেছি যা আমার তাই চাইতে । মা ভবানী বাপ্নাকে যে খাঁড়া দিয়েছিলেন, সে খাঁড়া এইখানে আছে আমি তাই চাই ! তারই জন্তে আমার মা আমাকে পাঠিয়েছেন—আমি চিতোরের রানা হাথির !”

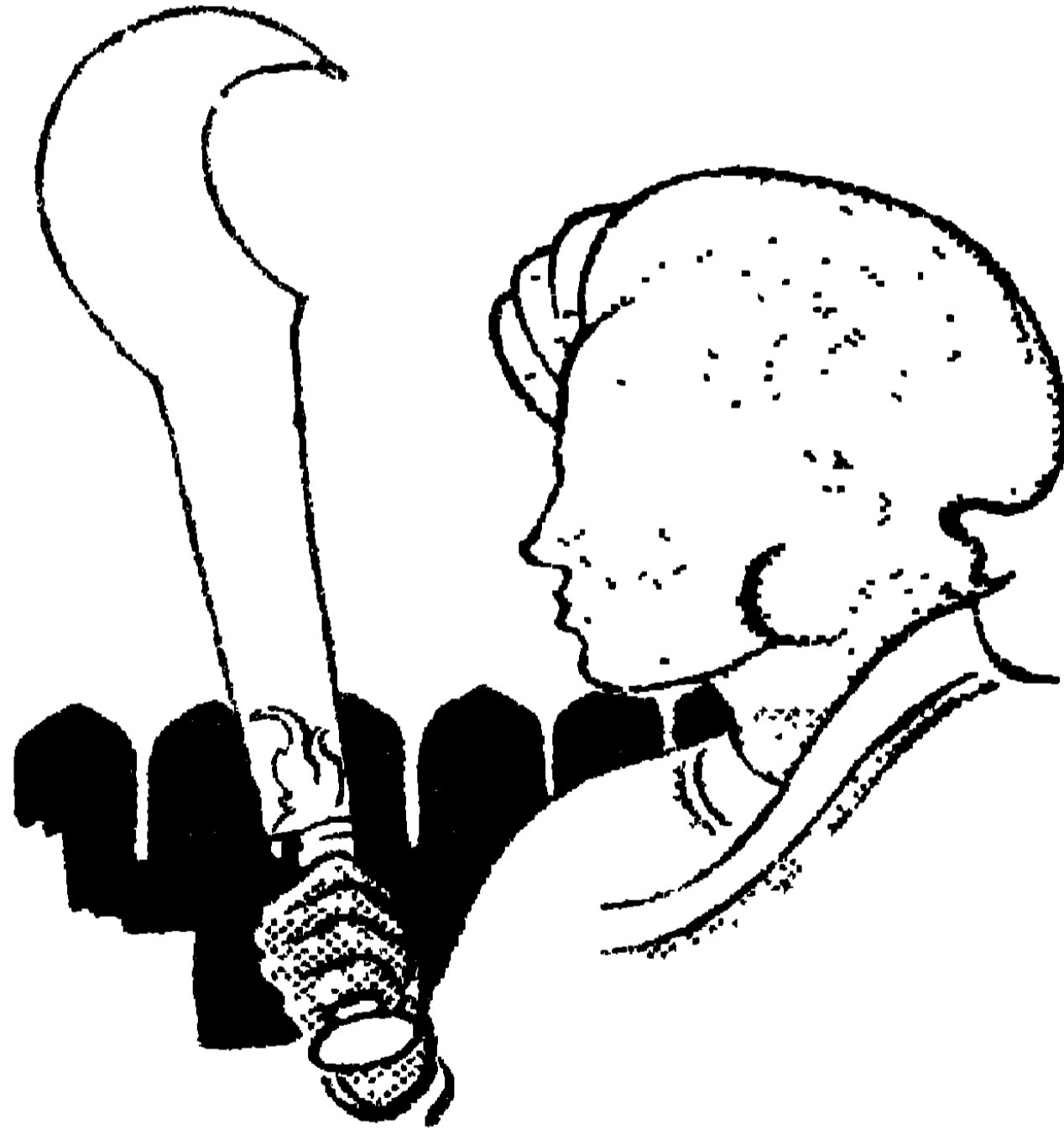
ভৈরবীরা হাথিরের কথায় উত্তর না দিয়ে আগুনের উপর সেই লোহার কড়াখানার দিকে দেখিয়ে দিলেন । হাথির ছুটে গিয়ে যেমন সেই কড়াখানার ভিতর হাত দিয়েছেন অমনি কোথায় সে আগুন, কোথায় সে কড়া, কোথায় বা সে ভৈরবীর দল ! হাথির দেখলেন ভবানীর খাঁড়া হাতে



তিনি কমলারাণীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন ; আর অজগর সাপের মতো খানিকটা ধোঁয়া সেই স্তম্ভের মুখ থেকে বেরিয়ে চলেছে আশু আশু হাশ্বির ভবানীর খাঁড়া হাতে যেদিন চিতোরের রাজসিংহাসনে উঠে বসলেন, সেদিন সমস্ত রাজস্থানে জয়জয়কার পড়ল । দিল্লীর বাদশা মহম্মদ খিলিজি সে দিন পঞ্চাশ লাখ মোহর হাশ্বিরকে নজর দিয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন এ জীবনে আর চিতোর-যুধা হবেন না ; তবে তিনি ছাড়া পেলেন ।

কমলকুমারী হাশ্বিরকে ভবানীর খাঁড়াখানির সন্ধান দিয়েছিলেন বলে হাশ্বির তাঁর কথায় বনবীরকে ছেড়ে দিলেন আর কৈলোরের কেল্লার নাম রাখলেন—কমলমীর ।

লক্ষ্মীরাণী হাশ্বিরকে সিংহাসনে বসিয়ে উজলা গ্রামে তাঁর বাপের বাড়ি চলে গেলেন তাঁর সেই ছেলেবেলার ঘরে নদীর পারে ক্ষেতের ধারে ।







८५



হাধিরের ন্যূতি লখারানা—লড়াই করতে করতে তিনি এখন বুড়ো হয়েছেন। আর তাঁর তলোয়ার, সে শত্রুর মাথা কাটতে কাটতে এমন ভোঁতু হয়ে গেছে যে কেবল মুঠসার একগাছা আখ কাটবারও ধার তাতে নেই। তলোয়ারে ধার না থাকুক লখারানার কিন্তু কথার ধার খুবই ছিল; ঠাট্টায় তামাশায় তাঁর মুখের কাছে দাঁড়ায় কার সাধ্য? বয়সের সঙ্গে রানার মসকরা করবার বাতিক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল।

সে এক দিনের কথা—শাদা জামাজোড়া, শাদা দোপাট্টা, পাকা চুলের উপরে ধবধবে পাগড়ি প'রে লখারানা লককা পায়রাটি সেজে বসে আছেন। পাহাড়ের উপর শ্বেত পাথরের খোলা ছাদ আধখানায় চাঁদের আলো পড়েছে, আর আধখানায় কেজার উঁচু পাঁচিলের কালো ছায়া বিছিয়ে গিয়েছে; রানার চারিদিকে সভাসদ পারিষদ, সকলের হাতে এক এক খোঁরা সিদ্ধি। এখনি জলসা শুরু হবে—চাকরেরা বড় বড় খালায় ফুলের মালা, পানের দোনা এনে রেখেছে, গোলাব আর আতরের গন্ধ, ছাদের এক কোণে একদল নাচনী সোনার ঘুঙুর এ ওর পায়ে জড়িয়ে দিচ্ছে। এমন সময় রাজকুমার চণ্ডের সঙ্গে মাড়োয়ারের রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে রণমল্লের দূত এসে উপস্থিত—রূপোর পাতে মোড়া একটি নারকেল হাতে। মাড়োয়ারের দূত বেশ একটু মোটা; তার উপর এগারগজি খানের প্রকাণ্ড এক পাগড়ি বেঁধেছেন আর তাঁর আগে আগে পেটটি এগিয়ে চলেছে। দূতকে দেখে লখারানা অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন কিন্তু এই মানুষ লাটিমকে নিয়ে একটু মসকরা করবার লোভ তিনি আর কিছুতেই সামলাতে পারলেন না।

রানা দূতের হাত থেকে রূপোয় মোড়া নারকেলটি নিজেই নিয়ে বলছেন, “বাঃ বেশতো, এটা বুঝি তোমার রাজা এই বুড়ো বয়সে আমার খেলার জন্তে পাঠিয়েছেন?” দূতের বলা উচিত ছিল—আজ্ঞে না, এটি রাজকুমার চণ্ডের জন্তে কেননা তাঁরই সঙ্গে আমাদের রাজকুমারীর বিয়ের কথা

নিয়ে এসেছি, আপনার মতো পাকা দাড়ির খেলার জিনিস এটি নয়—কিন্তু রানার ভাব-গতিক দেখে দূতের মুখে আর কথা সরছে না। এদিকে সভাপুঙ্ক মুখ টিপে হাসছে, ওদিকে লজ্জায় রাজকুমার চণ্ডের মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে। দূত তখন বিষম সমস্যায় পড়ে বলছেন “মহারানা, বড় স্মুখের কথা যে আপনি নিজেই আমাদের রাজকুমারীকে চাইলেন, আমাদের দেশের রাজা গরীব, তাঁর এতদূর সাহস কেমন ক’রে হবে যে বিয়ের সঙ্কল্প ক’রে মহারানাকে নারকেল পাঠাবেন ? তিনি চেয়েছিলেন রাজকুমারকে জামাই করতে, কিন্তু কি আশ্চর্য, তিনি স্বপ্নেও যা আশা করেননি তাই ঘটল ! মহারানার যদি হুকুম হয় তবে আমি আমার রাজাকে গিয়ে এই স্মুখের খবর এখনি পাঠিয়ে দিই”—বলেই দূত উঠতে যান—রানা তখন কি জবাব দেন, তাড়াতাড়ি দূতের হাতে ধরে বললেন, “বোসো আমি তামাশা করছিলাম, ডাকো কুমার বাহাদুরকে”—কুমার তখন সভা ছেড়ে উঠে গেছেন। রানার দূত চণ্ডের কাছে ছুটল কিন্তু চণ্ড ব’লে পাঠালেন—মহারানা তামাশা ক’রেও যে রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চেয়েছেন তিনি আজ থেকে আমার মায়ের তুল্য, আমি কিছুতেই তাঁকে বিয়ে করব না।

বুড়ো রানা বড় বিপদেই পড়লেন। কি আশ্চর্য, ছেলেটা তামাশা বোঝে না ! লোকের পর লোক রাজকুমারকে বোঝাতে ছুটল কিন্তু চণ্ডের প্রতিজ্ঞা অটল। রানা নিজের কথার ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়লেন। এবারের তামাশা যে জাহ্নকরের আমগাছের মতো দেখতে-দেখতে এমন সত্যি হয়ে উঠবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি ; বিয়ে করতে দুঃখ নেই কিন্তু তামাশাটা যে দূতকে ছেড়ে উল্টে তাঁকে নিয়েই শুরু হল এইটেতেই তাঁর আপত্তি।

অনেক বোঝানোর পরেও যখন চণ্ড বিয়ে করতে রাজী হলেন না তখন রাগে বুড়ো রানা পাকা দাড়িতে মোচড় দিয়ে বললেন, “দেখ চণ্ড, তোমার

প্রতিজ্ঞা তুমি রাখ ; কিন্তু আমিও প্রতিজ্ঞা করলেম, এবার আমার যে ছেলে হবে তাকেই আমি সিংহাসন দেব, সেই হবে রানা আর তোমাকে তার একজন সামন্ত হরে থাকতে হবে !” চণ্ড একলিঙ্গ মহাদেবের নামে শপথ করে বললেন, “তাই হবে !” সভাশুদ্ধ লোক চুপ হয়ে রইল । মাড়োয়ারের দূত রানার বিয়ের ছকুম নিয়ে বিদায় হল ।

বুড়ো বয়সে বর সেজে যে তামাশা দেখাতে হল সেটা লখারানার বড়ই বাজল ; তিনি চণ্ডকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারলেন না । বিয়ের ছবছর পরে ছমাসের ছেলে মকুলকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তিনি এক কঙ্কল এক লোটা নিয়ে তীর্থ করতে বেরিয়ে গেলেন—কবে কোন-খানে জীবনের বিষম তামাশার থেকে তাঁর যে নিষ্কৃতি হল তা জানা গেল না ।

মকুল তখন তারি ছোট, নেহাৎ কচি—কাজেই রাজার যা কিছু কাজ সবই চণ্ডকে করতে হয়, রাজা না হয়েও তিনি রাজা । দেশের লোকের মুখে চণ্ডের স্মৃতি আর ধরে না । চণ্ডকে তারা যেমন ভয় করে তেমনি ভক্তিও করে, ভালোও বাসে ; এটা কিন্তু মকুলের মায়ের আর যত মাড়োয়ারী মামার দলের প্রাণে নয় না । চণ্ড কাউকে কিছু বলেন না—কিন্তু বোঝেন তাঁর আর বেশি দিন এ রাজ্যে থাকা চলবে না । এই যে রাজবাড়ি যেখানে চণ্ড মায়ের কোলে মানুষ হয়েছেন, বাপের আদরে বেড়ে উঠেছেন, এখানে তাঁর আপনার বলতে আজ কে আছে ? পুরানো চাকর যারা ছিল মহারানী তাদের তাড়িয়ে নিজের দেশ থেকে যত মাড়োয়ারী এনে কাজে রেখেছেন । তাঁর নিজের যে মহল সেখানে রাণীর ভাইরা এসে ঢুকেছেন, তার যে সোনা রূপোর খাট বিছানা আসবাবপত্র সবই এখন মকুলের, রাজবাড়িতে নিজের বলতে রয়েছে একমাত্র তাঁর তলোয়ার ! কিন্তু মকুল—সেই অফুটন্ত ফুলের মতো কচি মকুল, তাঁর চেয়ে পঁচিশ বছরের ছোট মকুল, সেই হাসি মুখে ছোট ভাই মকুল—যে

এখনো চলতে শেখেনি, বলতে শেখেনি, সে কি তাঁর আপনার নয় ?  
 সকালে সন্ধ্যায় রাজসভাতে নিয়ে যাবার সময় সে যখন তার ছোট ছোট  
 হাত দিয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে, তখন কি আর চণ্ডের কোন দুঃখ  
 মনে থাকে ? চণ্ড কতবার মনে করেছেন চলে যাই, কিন্তু এই ছোট  
 ভায়ের ছোট হাতের বাঁধন—তাঁর সব দুঃখের উপরে কচি দুখানি হাতের  
 পরশ—একে ছেড়ে যাওয়া, একে কাটিয়ে বেরিয়ে পড়া চণ্ডের আর হয়ে  
 ওঠে না। তিনি বছরের পর বছর সব দুঃখ সয়ে এই ছোট ভাই মকুলকে  
 একদিন মেবারের রাজসিংহাসনে বসবার মতো উপযুক্ত ক'রে, মানুষ করে  
 তুলতে লাগলেন। দারুণ গরমের দিনে সকাল-সকাল সভা ভঙ্গ ক'রে  
 মকুলকে নিয়ে চণ্ড খোলা ময়দানে গোলা-খেলা করতে যান, চণ্ড চড়েন  
 এক ঘোড়ায় আর এক টাটুতে মকুল—মাথার উপরে রোদ বাঁ-বাঁ  
 করছে, কোথাও একটু ছায়া নেই, এরি মাঝে দুই ভায়ের ঘোড়া বিছাতের  
 মতো গোলার পিছনে-পিছনে ছুটে চলেছে—মুখে চোখে আগুনের  
 মতো বাতাস লাগছে, দুই ভায়ের মুখ রক্তের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে  
 সূর্যের তাপে। আবার হয়তো কোনো দিন ঘোরতর মেঘ ক'রে রূপ-রূপ  
 বৃষ্টি নেমেছে—চণ্ড চলেছেন মকুলকে নিয়ে শিকারে—কাদা ভাঙতে-  
 ভাঙতে, জলে ভিজতে-ভিজতে, ঠেং-ঠেং করছে নদীতে জল, সঁতার দিয়ে  
 তা পেরিয়ে, বাড়ি থেকে অনেক দূরে গ্রাম ছাড়িয়ে অনেকখানি—জঙ্গল  
 আর জলার মাঝে। শীতের দিনে তাঁদের খেলা পাহাড়ে-পাহাড়ে  
 সেখানে বরফের মতো বাতাস ধারালো ছুরির মতো বুকে এসে লাগে।  
 এমনি ক'রে মকুল মানুষ হচ্ছেন, দিন দিন শক্ত হচ্ছেন, তাঁর খাওয়া-পরা  
 খেলাধুলো রাজার ছেলে ব'লে কিছু যে আরামের ছিল তা নয়—চণ্ড  
 মেবারের একজন সামান্য রাজপুত্রের ছেলের সঙ্গে যে একদিন মেবারের  
 সর্বময় কর্তা হবে তার কোনো বিষয়ে কিছু তফাৎ রাখলেন না ; এমনি  
 ক'রে লথারানা চণ্ডকে মানুষ করেছিলেন, আর ঠিক তেমনি ক'রে চণ্ড



তাঁর ছোট ভাইকে সিংহাসনের উপযুক্ত হবার, আপদে বিপদে দুঃখে কষ্টে  
বীরের মতো নির্ভয় থাকবার জন্তে ছোট বেলা থেকেই তৈরী করছেন।  
এটা কিন্তু মকুলের মায়ের ভালো লাগে না। তিনি চান গরমে মকুল পাখার  
বাতাসে, বাদলে ছাতার তলায়, শীতে লেপ-তোশকের মধ্যে থেকে  
মোমের পুতুলটির মতো গোলগাল মোটামোটা হয়ে উঠুক ! এর জন্তে  
মকুলকে আর কখনো কখনো চণ্ডকেও মহারাণীর কাছে গল্পনা সহঁতে  
হয়। মকুল সে ছেলেমানুষ, মায়ের ধমকে কখনো রাগ করে, কখনো  
খানিক কাঁদে আবার একটু পরেই সব ভুলে যায়—চণ্ডের প্রাণে কিন্তু  
রাণীর বাক্যবাণ তীরের মতো গিয়ে বাজে।

এক একদিন তিনি আপনার খুব প্রাণের ঝাঁরা বন্ধু বুড়ো বুড়ো সর্দার  
তাঁদের কাছে বলেন—“আর না, এখানে আর থাকা চলে না। সবাই  
বলে আমি আমার ভাইকে বশ ক’রে নিয়ে নিজে রাজাগিরি করছি ; সে  
যখন আমার ছকুমে ওঠে-বসে, তখন আমিই হলেম সত্যি রাজা আর সে  
একটা সাক্ষিগোপাল—নামে মাত্র মেবারের রানা। আপনারা আমার  
ছুটি দিন, আমি অন্য রাজ্যে গিয়ে থাকি।” বুড়ো সর্দারেরা বলেন,  
“এখনো সময় হয়নি, যুবরাজ, আরো কিছুদিন থাক, মকুল আর একটু  
উপযুক্ত হয়ে উঠুক।”

চণ্ড চান কোনো সর্দারের হাতে মকুলকে মানুষ করবার ভার দিয়ে  
বেরিয়ে পড়েন কিন্তু কোনো সর্দার সে ভার নিতে চাইলে তবেতো !  
তাঁরা কেবলি বলেন—আমরা মকুলের জন্তে সব করতে প্রস্তুত কিন্তু  
যুবরাজ তবু আমরা পর মাত্র আর আপনি তার ভাই। চণ্ড আর কোনো  
জবাব দিতে পারেন না। বাপ থাকলে কেউতো চণ্ডকে মকুলের জন্তে কষ্ট  
নিতে বলত না ; কিন্তু এখন ভাই যদি তাকে না দেখে তবে মকুলকে  
রাজা হবার মতো শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে মানুষ ক’রে তোলে কে ?

এমনি ক’রে দিন কাটছে, ইতিমধ্যে একদিন—কাল বৈশাখের রাত

ছপুয়ের অন্ধকার দিয়ে বড়-বড় শাদা মেঘ একখানার পর একখানা  
 আস্তে আস্তে পূব থেকে পশ্চিমে চলেছে, মনে হচ্ছে যেন বড়-বড় পাল  
 তুলে আকাশের এপার থেকে ওপার অন্ধকারে পাড়ি দিচ্ছে একটির পর  
 একটি নৌকা ! একটি তারা নেই, একটু শব্দ নেই । চণ্ড সারাদিনের কাজ  
 সেরে সেই দিকে চেয়ে আছেন ঘরের আলো নিবিয়ে একলাটি, রাজ-  
 : বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে, কেবল চণ্ড জেগে একা । আজ চণ্ডের বুকের ভিতরে  
 একটা বেদনা থেকে থেকে দুই পাঁজরের হাড়গুলো মোচড় দিয়ে দিয়ে  
 যেন ভাঙতে চেষ্টা কচ্ছে ! ব্যথা যে কিসের, বেদনা যে কতটা, চণ্ড তা  
 বুঝতে পারছেন না ; তাঁর কেবলি মনে হচ্ছে মকুলকে একবার কাছে  
 ডাকি কিন্তু উঠতেও পারছেন না, ডাকতেও পারছেন না । অন্ধকারের  
 মধ্যে একলাটি চূপ ক'রে প'ড়ে রয়েছেন । চণ্ডের দেহ-মন সমস্ত অসাড়  
 হয়ে মরে গেছে, কেবল তাঁর চোখ যেন জীবনের সব আলোটুকু টেনে  
 নিয়ে প্রহরের পর প্রহর বর্ষার রাতের অন্ধকারে কি যেন সন্ধান ক'রে  
 ফিরছে ! একটা বড় অনেকখানি ঠাণ্ডা হাওয়ার ধাক্কায় গাছপালা ঘর-  
 বাড়ি জলস্থল আকাশ ছলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি বৃষ্টির জল ঝর ঝর  
 ক'রে চারিদিকে ঝরে পড়ল, বিদ্যুৎ বাজ খানিক চমক দিয়ে ধমক দিয়ে  
 চলে গেল ; তারপরে, মেঘ আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে এল, রাত্রি-  
 শেষের সঙ্গে রূপোর মতো শাদা আলো ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে  
 এসে অন্ধকারকে ক্রমে ফিকে ক'রে ভোরের একটি ছোট পাখির গানের  
 সঙ্গে-সঙ্গে ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল ; ঠিক সেই সময় বাদলা দিনের  
 সকাল বেলায় ফুটন্ত কচি আলোর মাঝখানে একখানি জলে ভরা মেঘ !  
 চণ্ড দেখছেন, সে কিবা চোখ জুড়ান শাস্ত রূপ—যেন তাঁর মা ! চণ্ড  
 সেই মেঘের দিক থেকে আর চোখ ফেরাতে পারছেন না, সারারাত্রি  
 অন্ধকারের মধ্যে তাঁর দুই চোখ যে এরই সন্ধান, এই তাঁর মরা মায়ের  
 সন্ধানে ফিরছিল, এতক্ষণে দেখা পেলেন ; তাঁর বুকের বেদনা টানা-তারা

ছেড়ে দিলে যেমন তেমনি কাঁপতে কাঁপতে একেবারে শাস্ত হয়ে গেল। সেই সারারাত্রে বাদল দিয়ে ধোয়া মেঘ, সেই মায়ের চোখের জলে জল-ভরা সেই সকালের মেঘ, তাঁরই দিকে চেয়ে চণ্ড ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে বেলা হয়েছে। রাজসভায় যাবার ঘণ্টা পড়েছে—মহারানী মকুলকে সাজগোজ করিয়ে বসে রয়েছেন এমন সময় মকুলের দাই এসে বললে, “রানীমা, আজ আর সভা বসবে না; বড় কুমার চণ্ডের শরীর খারাপ হয়েছে।” সেখানে মহারানীর বাপ রণমল্ল বসেছিলেন; তিনি ব’লে উঠলেন, “কেন বড় কুমার নইলে রাজসভা বন্ধ থাকবে, রানী মকুল কি কেউ নয়?” দাই সে অনেক দিনের, চণ্ডকেও সে মানুষ করেছে—রণমল্লের কথায় কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, রানী তাকে ধমকে বললেন “যা যা, তোর আর তকরার করতে হবে না; বাবা এখনি মকুলকে নিয়ে সভায় যাচ্ছেন; তুই সর্দারদের বসতে বলগে যা।” মেবারের সিংহাসনে সেই দিন সূর্যবংশের কেউ না বসে, বসল কি না পেটমোটা মাড়োয়ারী রণমল্ল নাতি মকুলকে কোলে নিয়ে! লজ্জায় সর্দারদের মুখ লাল হয়ে উঠল। সেই সময় চণ্ড হঠাৎ ঘুমের থেকে চমকে উঠে চেয়ে দেখলেন আকাশে গ্রহণ লেগেছে, সূর্য একখানা কলঙ্ক-ধরা তামার ধালার মতো দেখা যাচ্ছে আর সেই বুড়ি দাই তাঁর পায়ের তলায় বসে ছুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

সে দিন সভাভঙ্গের পর বর্ষাকালের আকাশের মতো মুখ আঁধার করে রাজপুত্র সর্দারেরা যখন চণ্ডের কাছে এসে উপস্থিত তখন চণ্ড তাঁদের হাত ধরে অমুরোধ করে বললেন, “দেখুন মহারানীমার ইচ্ছা নয় যে আমি আর মেবারের কোনো রাজকার্য চালাই; কাল রাত্রে একথা মহারানীমা নিজের মুখে স্পষ্ট করে বলেছিলেন, আজ সকালে তাঁরই ছকুমে মাড়োয়ারের রাজা রণমল্ল মকুলের দেখাশোনার ভার নিয়েছেন, এখন থেকে রাজ্যের কাজ তিনিই চালাবেন, আমার এখন ছুটি; মায়ের

আদেশ আজ সকালে আমার কাছে পৌঁছেছে, মকুলকে আর এই বাপার সিংহাসন আপনাদের জিম্মায় রেখে আমি এখনি বিদায় হব, আমার ঘোড়া প্রস্তুত।” বুকের ভিতর কি বেদনা নিয়ে চণ্ড যে সারারাত কাটিয়েছেন তা আর কারো বুঝতে বাকী রইল না, তাঁরা কোনো কথা না করে চণ্ডকে প্রণাম ক’রে বিদায় হলেন।

চণ্ড তখন তাঁর দাই-মাকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, “মকুলের যাতে ভালো হয়, তার না কোনো বিপদ ঘটে দেখবে; আমার ছোট ভাই রঘুদেও কৈলোরে আছে, আমি তার সঙ্গে দেখা ক’রে মাগুর রাজার কাছে চললেম। মহারাণীকে বলবে যদি কোনো দিন কোনো বিপদ আসে, রাজ্যে যদি কোনো গোলমাল হয় তবে আমি কাছেই রইলেম, আমাকে ডেকে পাঠালেই আবার আসব; আমার তলোয়ার মকুলের শত্রুর জন্তে, আর মেবারের জন্তে আমার প্রাণ। দাইমা, এরা কি যাবার আগে মকুলকে একবার দেখতে দেবে না?”

দাই ঘাড় নেড়ে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল; চণ্ড বুঝলেন ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবার কোনো উপায় নেই; তিনি একটি কথা না করে যেমন সাজে ছিলেন তেমনি, কেবল তলোয়ারখানা কোমরে বেঁধে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন—তখন মাথার উপরে ছুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। মকুল যখন শিকার খেলতে যাবার সময় তার দাদাকে খুঁজতে লাগল। তখন রাণী বললেন, “তোমার দাদাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, সে আর আসবে না।”

সারা দিন মকুলের চোখ ছল-ছল করতে লাগল; সে শূন্য রাজপুরীতে কোথাও আর তার দাদাকে খুঁজে পেল না। রাত্রে যখন সবাই শুয়েছে তখন মকুল তার দাইমার গলা জড়িয়ে বললে, “যে-বাঘ দাদাকে মেরেছে তাকে আমি বড় হয়ে নিশ্চয়ই মারব; তলোয়ারের এক চোটে তার মাথাটা কেটে এনে তোমায় দেব, কেমন?” দাই বললে, “রানাসাহেব,

আমি সেই বাঘটা ধরবার একটা দড়ির শক্ত ফাঁদ কাটাই বানিয়ে রাখছি,  
—বাঘটাকে কিছুতেই পালাতে দেওয়া হবে না।”

মকুল খানিক চুপ ক’রে বললে “দাইমা, বাঘটা দেখতে কেমন ? আমি  
তো বাঘ দেখিনি, তাকে চিনতে পারব তো ?”

“ঠিক চিন্তে পারবে, নয়তো আমি চিনিয়ে দেব। তোমার ওই  
মাড়োয়ারী দাদা মহাশয়ের মতো তার পেটটা মোটা আর ঠিক ওমনি  
খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফও তার আছে।”

তার পরদিন সকালে যখন দাই মকুলকে রাজসভায় সাজ পরিয়ে তার  
বুড়ো দাদার কাছে দিতে গেল তখন রণমল্ল পাকা গোঁফে চাড়া দিয়ে  
চোখ পাকিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, “দাই, বাঘ ধরবার ফাঁদ তৈরি  
করতে সময় লাগবে, সে জন্তে আজ থেকে তোমায় ছুটি দিলেম। আমার  
দেশের এক ভালো দাই সেই রাণীর কাজ করবে, তুমি বসে বসে ফাঁদ  
বাঁধো গিয়ে জঙ্গলে ;” দাই “যো হুকুম” বলে খুব একটা বড় সেলাম  
রণমল্লকে দিয়ে মকুলকে বললে, “রানাসাহেব, বাঘটাকে চিনে রেখ—  
ঠিক তোমার বুড়ো দাদার মতো গোঁফ দাড়ি ওমনি মোটা পেট আর  
বড়ো-বড়ো দাঁত।” সভাশুদ্ধ মুখ টিপে হাসতে লাগল। মকুল দুই চোখে  
একটা ভয় নিয়ে রণমল্লের দিকে চেয়ে এক দৌড়ে দাইয়ের কোলে গিয়ে  
উঠল।

দাই তার মুখে চুমু খেয়ে বললে, “বেটা ডরো মাং, সেরকো দেখ্ ভাগনা  
কতি নেহি, মার তলোয়ার কী চোট, কাট্ লে শির্।” সভাশুদ্ধ লোকের  
মুখে হাসি চাপা থাকে না দেখে রণমল্ল কথাটা চাপা দেবার জন্তে  
তাড়াতাড়ি একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে দাইয়ের পিঠ চাপড়ে তার হাতে  
এক জোড়া সোনার বালা দিয়ে বললেন, “ভালো-ভালো আমি খুব খুশী  
হলেম, এমনি ক’রে মকুলকে সাহস দিয়ে এখন থেকে বাঘ শিকারে মজবুৎ  
ক’রে তোল ; আজ থেকে তোমার তলব আরো দশ তনুখা বাড়িয়ে

দেওয়া গেল, মকুলজি বড় হওয়া পর্যন্ত তুমিই তার তদারক করবে।" সভাপুত্র লোক বুঝলে রণমল্লকে যদি কেউ জব্দ করতে পারে তবে সে দাই, আর রাজবাড়িতে তার মতো মকুলের বন্ধুও আর কেউ নেই। মেবারের সমস্ত রাজপুত সর্দার, যারা রাণীর খাতিরে রণমল্লকে ভয় ক'রে একটি কথা কইতেন না, তাঁরা আজ এই দাইকে মনে মনে তার সাহসের জন্তে তারিফ না করে থাকতে পারলেন না। রণমল্ল সেদিন মাথা হেঁট ক'রে রাজসভা থেকে বিদায় হলেন।

চণ্ডের ছোট ভাই রঘুবীর, কিন্তু মেবারের সবাই তাঁকে নাম দিয়েছিল রঘুদেব—রূপে গুণে তিনি ছিলেন বাস্তবিকই দেবতার মতো। নগরের বাইরে রাজ্যের গোলমাল থেকে অনেক দূরে একখানি সুন্দর বাগানঘেরা ছোটখাট পাথরের বাড়ি, তারই মধ্যে রঘুদেব একলা রাজার ছেলে হয়ে তপস্বীর মতো দীন দুঃখী কাঙাল নিয়ে থাকতেন। তাঁর মুখের কথা—সে যেন ছোট-বড় সবার মন গলিয়ে গানের মতো গিয়ে প্রাণে বাজতো। রাজ্যে তাঁর শত্রু ছিল না—এমন কি যে মহারাণী চণ্ডকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখতেন তিনিও রঘুদেবকে গুরুর মতো ভক্তি, ভায়ের মতো ভালোবাসা দিয়েছিলেন। আর মকুল—সে ছোড়দাদার মুখের গল্প, তাঁর সেই বাগানে ফল পেড়ে বনভোজন, গাছের পাখিদের বাসার খুব কাছে গিয়ে তাদের ছোট-ছোট ছানাগুলিকে খাইয়ে আসা, গাছের ছায়ার বসে বাঁশের বাঁশিতে রাখাল ছেলেদের কাছ থেকে গানশেখা, এই সব আনন্দের কথা কখনো ভুলবে না।

চণ্ড গিয়ে অবধি সে তার ছোড়দাদার কাছে যাবার জন্তে রোজ কাঁদছে, রাণীর ইচ্ছে তাকে কিছু দিনের জন্তে সেখানে পাঠিয়ে দেন কিন্তু রণমল্ল কেবলি বাধা দিচ্ছেন। রাণী একবার রঘুদেবকে রাজবাড়িতেই না হয় আনাবার কথা বললেন কিন্তু তাতেও আপত্তি! শেষে একদিন রণমল্ল স্পষ্টই ব'লে দিলেন যে, তাঁর হুকুম ছাড়া রঘুদেবের সঙ্গে দেখা করা কিংবা

তাঁকে এখানে আনান হতে পারবে না—রাণীর সেইদিন চোখ ফুটল; তিনি বুঝলেন, রাজ্যের কাজে তাঁর আর কোনো হাত নেই, এই পাথরের রাজবাড়ির চারখানা দেওয়ালের মধ্যে তিনি আর মকুল ছুজনকে বন্দীর মতো থাকতে হবে।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন খবর এল রঘুদেব মকুলকে দেখতে নগরে আসছিলেন, হঠাৎ মারা পড়েছেন; দেশের লোক হাহাকার ক’রে বলছে রণমল্ল তাঁকে বিষ দিয়ে খুন করেছে, সমস্ত মেবার তাঁর মূর্তি ঘরে ঘরে রেখে পূজো করছে আর মাড়োয়ারী শেয়ালরাজা আর তার দলবলকে খুনে, বদমাস, চোর ব’লে অভিসম্পাত দিচ্ছে।

বুড়ী দাই রাণীকে এসে বললে, “এখনো যদি ভালো চাও তো চণ্ডীকে খবর পাঠাও, না হলে তোমার মকুলের দশা কোনদিন রঘুদেওজীর মতো হবে।” কিন্তু খবর তাঁকে দেয় কে? যে চিঠি বইবে সে রণমল্লের লোক, আপনার লোক দিয়ে সে রাজ্যটা ভরিয়ে রেখেছে, তার চর রাণীর অন্তরে ঘুরছে, তার অনুচর সর্দারদের বাসায়-বাসায়, গ্রামে-গ্রামে, প্রজাদের ঘরে-ঘরে, পাঠশালায়, মন্দিরে, মঠে! কে কোথায় কি করছে, কি বলছে, সব খবর পাচ্ছে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারী রাজা রণমল্ল ডাকাতির সর্দার, চোরের শিরোমণি। নগরের ফাটকে-ফাটকে কেয়ার বুরুজে-বুরুজে তার চেলারা সব থানা বসিয়ে পাহারা দিচ্ছে দিন-রাত। রাগে ভয়ে হুঃখে রাণী অস্থির হয়ে পড়লেন, চারদিক অন্ধকার দেখতে লাগলেন, চণ্ডীকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি কি ভুলই করেছেন, আজ সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। রাণী বুড়ী দাই-এর ছুই পা জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “হায় আমার কি হবে?” যে রাণী একদিন তাকে দূর দূর ক’রে তাড়িয়েছিলেন, আজ তাঁকে পা জড়িয়ে কাঁদতে দেখে বুড়ীর চোখে জল এল। সে রাণীকে শাস্ত ক’রে বললে, “আমি খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করছি; কিন্তু রাণীমা, তুমি খুব

সাবধানে কাজ করবে যেন আমাদের মনের কথা কেউ জানতে না পারে। তোমার বাপ শুনতে পেলে বড় বিপদ হবে, তার মুঠোর ভিতরে এখন সমস্ত রাজ্য, সে যদি কাল গলা টিপে তোমার মকুলকে মেরে ফেলে, তবে ভয়ে কেউ একটি কথাও বলবে না।”

রাণীর সঙ্গে কথা ঠিক ক’রে দাই যেখানে বুড়ো রণমল্লটা সন্ধ্যাবেলা একলা ঘরে নিজের মতো মোটা একটা গেদী ঠেস দিয়ে একরাশ মোহর গুণে গুণে চটের থলিতে ভরে ভরে রাখছেন ঠিক বড় বাজারের মাড়োয়ারী এক একটা মহাজনের মতো, সেইখানে আশু আশু এসে উপস্থিত হল। দাইকে হঠাৎ আসতে দেখে বুড়ো মোহরগুলো ছুই ধাবায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “তবে—তবে অসময়ে কি মনে ক’রে ?”

“আজ্ঞে একটু সামান্য কাজ ছিল, যদি এখন ব্যস্ত থাকেন তো পরে আসব।”

রণমল্ল দাইকে ভয় করতেন, ঠিক দপ্তরখানার দপ্তরি যেমন তার মনিবকে ভয় করে। রাজ্যের সবাই রণমল্লের ভয়ে সারা কিন্তু রণমল্ল কাঁপেন দাইএর ভয়ে ; তাই তিনি ভাড়াভাড়ি দাইকে বললেন, “না না, আগে তোমার কাজটাই সেরে নিই।”

দাই তখন বললে, “আজ্ঞে মকুলজীর একটু ফরমাস আছে, তাঁর কবুতর পাল্‌বার সখ হক্কেছে, তাই হুজুরের কাছে দরবার করতে এসেছি।”

“মকুলজী পায়রা ওড়াবেন” ব’লেই বুড়ো হোঃ হোঃ ক’রে খানিক হেসে বললেন—“তা ভালো, এ সব শখ ভালো—পায়রা ওড়ান, ছাগল পালুন এতে আমার আপত্তি নেই ; ঘোড়া চড়া, তলোয়ার খেলা এগুলো ছাড়লেই বাঁচি, রাজার ছেলে ও-সব কেন ? খান দান ঘুড়ি ওড়ান, সূখে থাকুন আর”—দাই ব’লে উঠল—“আর রাজার ছেলের দাদামহাশয় বুড়ো মাড়োয়ারী সিংহাসনে বসে কেবল মোহরের তোড়া বাঁধুক ?”



“ঠিক বলেছ দাই, আমি তোমার উপর বড় খুশী আছি ; মকুলজীকে তুমি এরকম পায়রা আর ঘুড়ি দিয়ে ভুলিয়ে রাখ আর ছুটো বছর, তার পর দেখা যাবে সিংহাসন আমার কাছ থেকে কেমন ক’রে এরা কেড়ে নেয় ! এই নাও”—ব’লেই একটা মোহর বুড়ো অনেক কষ্টে খলি থেকে বের ক’রে দাইএর হাতে দিতে গেলেন ।

দাই হাত জোড় ক’রে বললে, “আপনার মোহর আপনার কাছেই থাক, মকুলজীর কবুতর কেনবার পয়সার অভাব নেই ।”

“হাঁ, তা কি আর আমি জানিনে ! তার মায়ের হাতে অনেক টাকা আছে, তা যাও তোমরাই তবে কবুতর জোড়ার দাম দিও । প্রজাদের খাজনা অনেক বাকি পড়েছে এখন আমার হাতে একটি পয়সা নেই”—ব’লেই বুড়ো আবার টাকা গুণতে লাগলেন । দাই একটা মস্ত সেলাম ক’রে সেখান থেকে চলে গেল ।

কেল্লার ছাদের এক কোণে পাথরের একটা টানা বারাণ্ডার কার্নিস খানিক ছায়া ফেলেছে, তারই তলায় একটি বাঁশের খাচার দুটি পায়রা সকাল বেলায় দিকে চেয়ে গলা ফুলিয়ে চুপটি ক’রে বসে আছে, এখনি মকুল এসে তাদের খাচাটি খুলে আকাশের আলোর মাঝে তাদের ছেড়ে দেবে এই আনন্দে তাদের শাদা রঙের ডানা দুখানি থেকে থেকে উলুসে উঠছে । এমন সময় মহারাণীর সঙ্গে দাই এসে পায়রা দুটির ডানার নিচে দুখানি ছোট চিঠি বেঁধে দিয়ে আন্তে আন্তে আবার খাচার দরজা বন্ধ ক’রে চলে গেল ।

তখনো সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পড়েনি, রাজকুমার মকুল নরম বালিসের উপরে মাথাটি রেখে একটি হাত পুবের জানালার দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে মুঠোয় এক টুকরো কাগজ ধরে । রাণী এসে তার ঘুম ভাঙিয়ে কোলে ক’রে দাইয়ের কাছে দিয়ে বললেন, “তুই এখনো ঘুমচ্ছিলি ? বেলা হয়েছে, কখন আর তোর দাদার কাছে পায়রার

গলায় বেঁধে চিঠি-পাঠাবি ?” মকুল কোনো কথা না ব’লে দাইকে টানতে-টানতে এক ছুটে ছাদে এসে উপস্থিত হল। দাই হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, “কই, মকুলজী তুমি যে বলেছিলে চিঠি লিখে রাখবে, তা কই ?” মকুল হাতের মুঠো খুলে দেখালে সেই হিজি-বিজি লেখা কাগজখানি। দাই কাগজটি এপিঠ-ওপিঠ উল্টে-পাল্টে বললে, “বহুৎ আচ্ছা, চিঠি পড়তো শুনি কুমার সাহেব কি লিখেছ।” মকুল জানত কেমন ক’রে চিঠি পড়তে হয়, তাই সে গম্ভীর হয়ে আরম্ভ করলে :—

দাদা, আমি তোমার ছোট ভাই, তোমার জন্ম কাঁদচি, একবার এসো, খুব খেলা হবে ; কবুতর ছুটো চিঠি নিয়ে যাচ্ছে জবাব দিও। এদের ছানা হলে তোমায় একটা দেব। আমি খুব ভাল আছি। ইতি—

মকুল

তোমার ছোট ভাই

পুঃ—মা আর দাই তোমার জন্ম খালি কাঁদে।

“চিঠি যেমন হতে হয়”—ব’লে দাই কাগজখানা নিয়ে বেশ করে মুড়ে বললে, “তবে এখন কোন্ দাদাকে চিঠিখানা পাঠাতে চাও বল।” এইবার মকুল মুস্কিলে পড়ল, বড়দাদা আর ছোটদাদা দুই দাদার মধ্যে বেছে নেওয়া তার পক্ষে শক্ত হল ; দুইজনকেই সে সমান ভালোবাসে, দুইজনকেই সে চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতে চায়। কিন্তু হায়, চিঠি তার একখানি বৈ নেই ! ভাবনায় তার মুখ শুকিয়ে গেল, তখন রাণী আস্তে আস্তে তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, “এক কাজ কর, আধখানা চিঠি বড়দাদাকে, আর আধখানা ছোটদাদাকে পাঠিয়ে দে।” তাই হল। প্রথম টুকরো ছোটদাদার আর বাকিটুকু বড়দাদার জন্মে ছিঁড়ে মকুল দাইএর হাতে দিল।

শাদা ডানা দুই পায়রা সেই ছটুকরো কাগজ গলায় বেঁধে আকাশে

উড়ল, ডানার তলায় লুকোন রইল তাদের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে চণ্ডের কাছে রাণী আর দাইএর ছুখানি চিঠি। সোনা-মাখান মেঘের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে ছুটি পাখি ছোট-বড় ছুজনের ডাক বয়ে, সূর্যের আভা আকাশ রাঙিয়ে তাদের ছুজোড়া ডানার পালকে এসে ঠেকেছে শাদা পালে হাওয়ার মতো। চিতোরের কেল্লার বন্দী অসহায় মকুল আর তার মায়ের ডাক সকালের সোনার-মাখা, ছপূরের রোদে পোড়া, সন্ধ্যার মেঘ আর আলোর চিত্র-বিচিত্র দিনের মধ্যে দিয়ে রাত্রির নীল-গোলা অন্ধকার আকাশ পার হয়ে যেদিন মান্দুর কেল্লার চণ্ডের কাছে এসে পৌঁছল সেদিন চণ্ড সব ছুঃখ সব অপমান ভুলে অনেক দিনের কোনে-রাখা তলোয়ার আর একবার কোমরে বেঁধে উঠে দাঁড়ালেন।

আজ তিনদিন ধরে একটা প্রকাণ্ড ঝড় রাজস্থানের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে—তারই মধ্যে থেকে এক একবার সকালে সন্ধ্যায় সূর্যদেব দেখা দিচ্ছেন রক্ত-মূর্তি! চণ্ড যখন চিতোর ছেড়ে চলে আসেন তখন তিনশ' ভীল তাঁর সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। আজ তারা চণ্ডের হুকুম নিয়ে চিতোরে আবার ফিরছে ঝড় জল বিছাতের মধ্যে দিয়ে।

চিতোর থেকে খানিকটা দূরে গো-সুন্দ নগর পাহাড়ের উপরে একটা মঞ্জবুৎ কেল্লা আর তাকেই ঘিরে ছোট ছোট বাড়ি, পাহাড়ের নিচে অনেকখানি ঘন বন, তার মধ্যে দিয়ে ছোট ছোট নদী বয়ে চলেছে, এই বনে চণ্ড তার দলবল নিয়ে লুকিয়ে রইলেন। কথা ঠিক হল যে, মহারাণী সূন্দেশ্বরীর পূজো দেবার ছল ক'রে মকুলজীকে নিয়ে এইখানে এসে দেওয়ালীর দিন চণ্ডের সঙ্গে মিলবেন।

এদিকে চণ্ডের অনুচর যত ভীল মেবারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে রটিয়ে দিয়েছে—রণমল্ল মকুলজীকে মেরে ফেলেছে। লোক সব গ্রামে গ্রামে মাঠে ঘাটে এই গুজব শুনে একেবারে ক্ষেপে উঠে লাঠি-তলোয়ার তীর-

ধক্ক নিয়ে চিতোরের দিকে দল বেঁধে চলেছে—যদি একথা সত্য হয় তবে সেই পেটমোটা মাড়োয়ারের রাজা রণমল্লকে আর আশু রাখবে না। রণমল্ল এই খবর পেয়ে ভয়ে কাঁপছেন, কি উপায় করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। সেই সময় একদিন দাই এসে তাঁকে বললে, “হজুরের মেজাজ ভালো বোধ হচ্ছেনা, একটা খবর শুনে আমারও ভয়ে গা কাঁপছে; শুনেছেন দেশের লোকে তাদের রানা মকুলকে দেখবার জন্তে লাঠি-সোঁটা নিয়ে এই দিকে আসছে।” রণমল্ল খবরটা খুব ভালো ক’রেই শুনেছিলেন তবু দাইকে ধমকে বললেন, “যাও যাও, মাড়োয়ারের রাজা আর মেবারের এখনকার সর্বেসর্বা ছু-দশগাছা লাঠির ভয়ে কাঁপেনা, আর কিছু খবর থাকেতো বল।”

দাই তখন চুপি চুপি বললে, “এবার যে-দল আসছে বড় শক্ত দল, মেবারের রাজপুতকে আপনি চেনেন না, এই বেলা যা হয় উপায় করুন।”

রণমল্ল মনে ভয় কিন্তু মুখে সাহস দেখিয়ে ব’লে উঠলেন, “কি উপায় করতে হবে শুনি?” দাই বললে, “মকুলজীকে একবার গ্রামে গ্রামে শিকার খেলবার জন্তে পাঠিয়ে দিন। লোকে দেখুক তাদের রানা বেশে সুখে বেঁচে আছে আর খেলে বেড়াচ্ছে। তা হলেই তারা ঠাণ্ডা হবে আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসবে না।” রণমল্ল খানিক গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, “মন্দ পরামর্শ নয় কিন্তু হাতিয়ার বেঁধে গ্রামে গ্রামে শিকার খেলে বেড়ানো তো হতে পারে না, শিকার থেকে লড়াই বাধতে কতক্ষণ? অথ কিছু উপায় থাকেতো বল।” “তবে রাণীমা আর মকুলজীকে পালকি চড়িয়ে গ্রামে গ্রামে দেবতাদের পূজা দেবার জন্তে পাঠিয়ে দিন, কাজ একই হবে।” এ পরামর্শটা রণমল্লের মনোমত হল, দাই রাণীকে আর মকুলজীকে পালকিতে চড়িয়ে চিতোরের কেলা পার ক’রে দিয়ে এল। যাবার সময় মকুল বললে, “দাই-মা, তুমি যাবে না?”

“না জী, বাঘ ধরবার সেই ফাঁদটা শেষ ক’রে তবে আমি তোমার কাছে যাব” —ব’লেই দাই চিতোরের কেলায় ফিরে এল।

গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর আজ ভারি ধুম, মহারাণী রানাজীকে নিয়ে কেলায় এসেছেন, খুব ঘট ক’রে আজ সুনন্দেশ্বরীর পূজা দেওয়া হবে। ঘরে ঘরে আজ প্রজারা পিঙ্গীম জ্বালিয়েছে, রাস্তার রাস্তায় দোকানীরা ঝাড় লঠন ছবি আয়না দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসে লোকের গায়ে কেবল গোলাপ জলের পিচ্কিরি দিচ্ছে। শহরের ছেলেগুলো রাস্তার মাঝে তুবড়ি পুড়িয়ে ছুঁচো বাজি ছেড়ে মকুলজীর সঙ্গে যে-সব ঘোড়সওয়ার এসেছে তাদের ঘোড়াগুলোকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখছে। ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হাউই উড়িয়ে চরকি ঘুরিয়ে ফুলঝুরি, রংমশাল, বোমা, দোদামা, ভুঁইপটকা, চিনে-পটকা পুড়িয়ে খুব খানিকটা ধোয়া আর খুব খানিকটা আমোদ ক’রে নিচ্ছে। মকুলের আজ আনন্দের সীমা নেই। এক সোনার সাজ-পরা কালো ঘোড়ায় চড়ে তিনি শহরময় ঘুরে ঘুরে দেওয়ালীর আলো দেখে বেড়াচ্ছেন। আর রাণীমা, কেলায় ছাদে একলা তিনি চুপ ক’রে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন, যত রাত বাড়ছে ততই তাঁর মনে হচ্ছে চণ্ড বুঝি এলেন না। আজ যে এই গো-সুন্দ নগরে দেওয়ালীর রাতে তাঁর দলবল নিয়ে আসবার কথা, কিন্তু কই ? দেখতে দেখতে শহরের আলো নিবে এল, মুকুল তাঁর ঘোড়া ফিরিয়ে কেলায় এলেন কিন্তু চণ্ডের আসবার কোনো লক্ষণ নেই, এই রাত্রে মধ্য ঠাঁদের চিতোরে ফিরতে হবে, আর তো সময় নেই। রাণী অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে কাঁদতে লাগলেন, দুই চোখের জল তাঁর বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিতে লাগল। এদিকে সুনন্দেশ্বরীর মন্দির থেকে ঢং ঢং ক’রে রাত দশটার ঘণ্টা পড়ছে, লোকজন প্রস্তুত হয়ে চিতোরে যাবার জন্তে পালকি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, মকুল রাণীকে ডাকছেন যাবার জন্তে কিন্তু রাণীর পা আর উঠছে না, তাঁর বুকের ভিতরে যেন হাতুড়ির ঘা দিয়ে অন্ধকারে ঘণ্টা বাজছে এক,

ছই, তিন, চার। রাত দশটার ঘণ্টা বেজে ধেমেছে—অন্ধকার আকাশ, বাতাস তারই শব্দের রেশায় এখনো রী রী করে কাঁপছে, ঠিক সেই সময় পাহাড়ের নিচে বনের মাঝ দিয়ে দশটা হাউই আগুনের সাপের মতো ফোস করে ফণা ধরে আকাশে উঠে দপ করে আলোর ফুল হয়ে আকাশময় ছিটিয়ে পড়ল—আলোয় চারিদিক দিন হয়ে গেছে, শহরের লোক আশ্চর্য বাজি দেখতে হৈ হৈ করে রাস্তায় ছাদে যে যেখানে পেরেছে বেরিয়ে এসেছে। রাণী মকুলের হাত ধরে বললেন, “সময় হয়েছে, আর দেবী না চল।” মকুলের ইচ্ছে আরো খানিক ছাদে দাঁড়িয়ে বাজি দেখেন। কিন্তু রাণী তাঁকে জোর করে ধরে পালকিতে ওঠালেন, আকাশের হাউই তাদের মাথার উপরে লাল আলোর পুষ্পবৃষ্টি করে অন্ধকার মিলিয়ে গেল। মকুল পালকি থেকে আবার কখন হাউই ওঠে দেখবার জ্ঞান মুখ বাড়িয়ে বসে রইলেন কিন্তু আকাশ যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই রইল।

মকুল রাত্রির মধ্যে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে থেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন, রাণীর পালকি নির্জন মাঠের পথে আস্তে আস্তে চলেছে, মাটির উপরে আটটা পালকি-বেহারার খসু খসু পায়ে শব্দ ছাড়া আর কোনো দিক থেকে কোনো শব্দ রাণীর কানে আসছে না। রাণী অন্ধকারের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে চেয়ে রয়েছেন। একবার মনে হল যেন একদল লোক খুব দূরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল, একবার দেখলেন যেন রাস্তার ধারে একজন কে বল্লম হাতে চুপ করে দাঁড়িয়ে—পালকি কাছে আসতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। গো-সুন্দ নগরে সেই দশটার তারা বাজি দেখে রাণী চণ্ড এসে পৌঁছেছেন বুঝেছিলেন, তারপর থেকে কিন্তু চণ্ডকে স্পষ্ট করে দেখা এখনো তাঁর ঘটে ওঠেনি। চণ্ড যে তাঁর কাছাকাছি আছেন, সেটা কেবল এই ছায়া-ছায়া রকম দেখছিলেন!

রাত গভীর—পালকি চিতোরের কাছাকাছি এসে পড়েছে, দূরে থেকে

কেল্লার দেওয়াল আকাশের গায়ে কালো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড় বেয়ে রাণীর পাল্কি কেল্লার ফটকের দিকে উঠে চলল কিন্তু তখনো চণ্ডের কোনো দেখা নেই। ঘোড়ার পায়ে শব্দ কি তলোয়ারের বন্ বন্ কিছুই শোনা যাচ্ছে না ; রাণীর বুক কাঁপছে, তাঁর চোখের সামনে কেল্লার ফটকের বড় দরজা দুখানা আন্তে আন্তে খুলে গেল যেন একটা রাক্ষস অন্ধকারে মুখটা হাঁ করলে। তারপর আন্তে আন্তে রাণীর পাল্কি কেল্লার মধ্যে ঢুকল, রাণী একবার পাল্কি থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে পিছনের দিকে দেখলেন ফটকের সামনে একদল ঘোড়সওয়ার খোলা তলোয়ার মাথায় ঠেকিয়ে তাঁর সঙ্গে কেল্লায় প্রবেশ করলে, তাদের সর্দার প্রকাণ্ড এক কালো ঘোড়ায়—মাথা থেকে পা পর্যন্ত তার কালোসাজ—নিমেষের মধ্যে এই ছবিটা রাণী দেখতে পেলেন ; চণ্ডকে চিনতে তাঁর বাকি রইল না। তারপর “জয় মকুলজী কি জয়, জয় চণ্ডজী কি জয়” শব্দে আকাশ কাঁপিয়ে উঠল, অমনি চিত্তোরে ছোট-বড়ো ছেলে-বুড়ো তলোয়ার খুলে রাজপথে রাণীর পাল্কির চারিদিক ঘিরে নিয়ে রাজবাড়ির দিকে চলল। যত মাড়োয়ারী যারা এতদিন বুক ফুলিয়ে রাজাগিরি ফলাচ্ছিল, সব আজ চণ্ডের নাম শুনেই ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকোল, কারো এমন সাহস হল না যে রণমল্লকে গিয়া খবরটা দেয়। আর খবর দিয়েই বা কি হবে ? দেওয়ালীর রাতে খুব ক’রে সিঁদ্ধি খেয়ে রণমল্ল খাটিয়ায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। দাই একগাছি মোটা দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সঙ্গে তাঁকে আছা ক’রে বেঁধে ছাদের উপর থেকে তামাশা দেখতে গেল। রণমল্লের ভোজপুরী আর মাড়োয়ারী দরোয়ান গুলো ঢাল-তলোয়ার বেঁধে তালপাতার সেপায়ের মতো কেবল হাত পা ছুঁড়তে লাগল, লড়াই দেবার আর সাধ্য হল না।

চণ্ড জোর ক’রে তাল ভেঙ্গে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোলমালে রণমল্ল জেগে উঠে দেখেন তাঁর চারিদিকে খোলা তলোয়ার, নিজের

হাত পা বাঁধা ; তাঁর সাহসও ছিল জোরও ছিল ; হাজার হোক তিনি মাড়োয়ারের রাজা, আর তলোয়ার দেখে তাঁর সিঁদ্ধির ঘোরও কেটে গেছে । তিনি পিঠে বাঁধা খাটিয়াখানা মুকুট দাঁড়িয়ে উঠে চণ্ডকে বললেন, “আমার বাঁধন খুলে দাও, তারপর দেখা যাবে কে জেতে কে হারে ।”  
তুমি বীর, রাজার ছেলে—আমিও একটা দেশের রাজা, আমাকে জানোয়ারের মতো বেঁধে মারা তোমার উচিত হয় না ।”

চণ্ড রণমল্লের বাঁধন খোলবার জন্তে ঘরে ঢুকবেন এমন সময় দাই ছুটে এসে বললে “সাবধান, ওকে একা পুড়ে মরতে দাও, সরে যাও, না হলে সবাই মরবে ।” হুম্ ক’রে একটা ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয়ে ঘরের কোণে একরাশ বারুদ জ্বলে উঠল, তারপর দাউ দাউ ক’রে ঘরখানায় আগুন লেগে গেল । ছুঁচো-বাজি দিয়ে ঘরখানা দাই যে কখন ভর্তি ক’রে রেখেছিল কে জানে ? ছুঁচোর মতো রণমল্ল পুড়ে মোলেন—“খুলে দে, খুলে দে” ব’লে চীৎকার করতে করতে । যাকে রাজবাড়ির দাসী ব’লে তিনি ঠাউরে ছিলেন, তারই হাতের বাঁধা দড়ির বাঁধ শেষ পর্যন্ত আগুনের নাগপাশের মতো তাঁকে জড়িয়ে রইল ।

কোথায় মেবার মাড়োয়ার ছুটো দেশ রণমল্ল দখল ক’রে বসবেন, না এখন তাঁর মাড়োয়ারের সিংহাসনটা পর্যন্ত মেবারের রানার হাতে এলো । তাঁর ছেলে যোধরাও বাপের সিংহাসন হারিয়ে এখন সামান্য গুটিকতক সৈন্য নিয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে চলল, অনেক দূরে লুণী নদীর ও-পারে ।

মহাবীর হরোয়া শংকল রাজর্ষি—লুণী নদীর ও-পারের সমস্ত পাহাড় নদী বন তাঁর রাজত্ব । তাঁর নামে সবাই মাথা নোয়ায় এমনি তাঁর বীরত্ব, এমনি তাঁর দয়া, তাঁর হুকুম অমান্য করে রাজস্থানে এমন লোক নেই । বিপদে যে পড়েছে তাকে উদ্ধার করা, দুঃখীর দুঃখ মোচন, অনাথকে



আশ্রয় দেওয়াই তাঁর কাজ, তাঁর যত অশুচর সবাই সন্ন্যাসী বীর, গাঁজাখোর নয়, কাজের মানুষ। কেউ কারু উপর অশ্রায় অত্যাচার করলে তাদের হাতে নিস্তার নেই, বনের ভিতরে পাহাড়ের গুহার তাদের সব কেলা, সেখানে জালা জালা টাকা পোঁতা আছে, লোকে চাইলে সেই টাকা দিয়ে তারা তাদের দুঃখু ঘোচায়। মাটির নিচে বড়-বড় ঘর, সেখানে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র লুকোন থাকে, কেউ বিপদে পড়ে তাদের কাছে এলে সেই অস্ত্র দিয়ে তারা তার সাহায্য করে, এমনি দলের রাজা তিনি হরোয়া শংকল। লুণী নদী সাঁতার দিয়ে পার হয়ে যোধরাও রাতদুপুরে এসে তাঁরই আশ্রয় চাইলেন; যোধরাও জানতেন, চণ্ডও ইচ্ছে করলে এখানে এসে গোলমাল করতে পারবেন না।

হরোয়া শংকল আদর করে যোধরাওকে বসালেন; তাঁর ছোট ঘর, রাজকুমারের সঙ্গে অনেক সেপাই, কাজেই সবাইকে গাছতলায় বসতে হল, সন্ন্যাসী রাজা একটু ভাবিত হলেন এত রাত্রে এত লোকের খাবার কেমন করে জোগাবেন, লোকেরাও অনেক পথ চলে এসে ক্ষিদেয় কাতর হয়ে পড়েছে। রাজর্ষি তাঁর দলবলকে ডেকে সকলের আহ্বারের সুবন্দোবস্ত করে দিতে বললেন, কিন্তু ঘরে তাঁর একটু ক্ষুদ্রও নেই, সেদিনের যা-কিছু চাল-ডাল সব তিনি অতিথদের বিলিয়ে দিয়েছেন।

বিপদে পড়ে চলারা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে দেখে রাজর্ষি বললেন, “অতিথকে তো খেতে দিতে হবে, এসো দেখি ঘরে কি আছে।” ঘরের এক কোণে সন্ন্যাসীদের কাপড় রাঙাবার জন্তে এক রাশ মুঁজলতা বোঝা বাঁধা ছিল, রাজর্ষি সেইগুলো দেখিয়ে বললেন, “যাও, এই গুলো রোধে আন।” রাধুনী এক সন্ন্যাসী, সে হেসে বললে, “প্রভু, এইবার অতিথ সেবার ঠিক বন্দোবস্ত করেছেন—যে মুখে ঠাকুরের ভোগ খাবে সেই মুখে কাল সকালে দেশে ফিরে কাউকে এবার আর ঠাকুরের অতিথ সেবার নিন্দে করতে হবেনা, এইবার ঠিক হয়েছে।” রাজর্ষি

হেসে বললেন, “আজ আমি নিজের হাতে রাঁধব, তোমাদের সবাইকে নিয়ে এক সঙ্গে খাওয়া যাবে, নিমন্ত্রণ করছি, সব চেলাদের ডাক দাও।”

গাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে রান্না শুরু হল, রান্নার গন্ধে বন আমোদ করলে কিন্তু তরকারি দেখে অবধি চেলাদের আজ আর মোটেই খিদে নেই, যদিও সকালে এক এক মুঠো ছোলা ছাড়া এ-পর্যন্ত কারো পেটে কিছু পড়েনি। কিন্তু, প্রভুর নিমন্ত্রণ কারো অগ্রাহ্য করার যো নেই। রান্না শেষ হলে সবাই অতিথদের জন্তে পাতা পেড়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আগে যোধরাও আর তাঁর লোকজনদের মোটা আটার রুটি আর মুঁজলতার সেই তরকারি খাইয়ে রাজর্ষি সব চেলাদের নিয়ে খেতে বসলেন, কেবল সেই রাঁধুণী চেলাকে অনেক ডাকাডাকি করেও কেউ আনতে পারলে না, সে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে জঙ্গলের কোনখানে যে লুকিয়ে রইল তার আর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। খাওয়া শেষ হলে সবাই রাজর্ষির রাঁধা তরকারির সুখ্যাতি করতে করতে যে যার জায়গায় গুতে গেল। মুঁজশাকের এমন যে রান্না হয় তারা কেউ জানত না, এবার থেকে রোজ এই তরকারি দিয়ে তারা রুটি খাবে এইসব বলাবলি করছে এমন সময় সেই রাঁধুণী এসে উপস্থিত ; সবার মুখে তরকারির তারিফ শুনে তার আর আপসোসের সীমা রইলনা। সে ভেবেছিল ওই রঙ করবার পাতাগুলো খেয়ে সবাই মাথা ঘুরে মরবে কিন্তু দেখলে সবাই দিকি পেট ভরিয়ে আরামে কঞ্চল মুড়ি দিয়ে ঘুমতে লেগেছে, কেবল শীতের রাতের ক্ষিদের জ্বালায় সেই-মরছে কেঁপে।

শীতের রাত সহজে কাটতে চায় না, রাঁধুণী ঠাকুরটিকে অনেক যন্ত্রণা দিয়ে তবে সে রাত পোহাল। সকাল উঠে সে একখানা কুড়ুল নিয়ে রান্নার কাঠ কাটতে চলেছে এমন সময় একজন বুড়ো মাড়োরারী সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা ; পাহাড়ের বারনার ধারে সে হাত-মুখ ধুচ্ছে, তার

দাড়ি-গোঁফ সব লাল রঙ-এর ছোপ-ধরা । কাল সন্ধ্যায় যার দাড়ি ছিল শাদা, আজ লাল হয়ে গেল ! এ ব্যাপার দেখে রাঁধুণী ঠাকুরটি আর হাসি রাখতে পারলে না, হোঃ হোঃ ক'রে হাসতে হাসতে সঙ্গীদের কাছে এই মজার খবরটা দিতে এসে দেখে, যত পাকা-দাড়ি-গোঁফওয়ালা ছিল তারা নিজের নিজের দাড়িতে হাত বোলাচ্ছে আর এ ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখছে সবার দাড়ি-গোঁফে লাল রঙের ছোপ । ইতিমধ্যে রাজর্ষি বেরিয়ে এলেন । তাঁর কিস্তি শাদা দাড়ি ধব ধব করছে । মুজ পাতার যে রঙ লেগেছে এটা কারুর মনে এলনা ; দাড়িতে রক্ত কোথা থেকে লাগল এই ভেবে সবার যখন ভয়ে মুখ শুকিয়ে এসেছে তখন রাজর্ষি সবাইকে অভয় দিলেন, “নির্ভয়ে থাক, তোমাদের মুখের সূর্য উদয় হতে আর দেরি নেই ; দেখনা এখনি তার রাঙা আলো তোমাদের মুখে এসে পড়েছে ; এখন কিছুদিন এইখানে বিশ্রাম কর, তোমাদের রাজত্ব ফিরে পাবার বন্দোবস্ত করা যাবে ।”

সেইদিন কাঠ কেটে রাঁধুণী ঠাকুর রাজর্ষিকে আর এক বোঝা মুজ পাতা এনে দিয়ে বললে, “ঠাকুর, আমাকে আজ একটু সেই তরকারি রেঁধে দিতে হবে ।” রাজর্ষি হেসে বললেন, “তোমার কালো দাড়িতে লাল রঙের ছোপ তো খুলবে না, আগে দাড়ি পাকুক তবে একদিন মুজ শাকের চচ্চড়ির ছোপ ধরিয়ে দেওয়া যাবে, আজ ভালো ক'রে অল্প তরকারি দিয়ে অতিথ খাওয়ানোর বন্দোবস্ত কর ।” রাঁধুণী ঠাকুরটি খেতে যেমন মজবুত রাঁধতেও তেমনি, আর রাজ্যের আজগুবি গল্প তার কাছে ; যোধরাও আর সঙ্গীদের বেশ আমোদে আহ্লাদে দিন কাটতে লাগল, বনে আছেন মনেই হত না ।

এদিকে হরোয়া শংকলের হুকুম চণ্ডের কাছে পৌঁছল—যোধরাওকে যেন মাড়োয়ারের সিংহাসন ফিরিয়ে দিয়ে ঝগড়া ঝাটি সব মিটিয়ে নেওয়া হয়—এর উপর আর কোনো কথা নেই । চণ্ডের দুই ছেলে মুঞ্জী আর কণ্ঠী

মাড়োয়ার শাসন করছিলেন : তাঁদের উপর হুকুম হল যে হরোয়া শংকল কিম্বা তাঁর কোনো লোক যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে আসামাত্র মাড়োয়ারের সিংহাসন যেন তাঁকে ফিরে দেওয়া হয়। হরোয়া শংকল দূতের মুখে এই খবর পেয়ে নিজেরই যোধরাওকে সঙ্গে নিয়ে মেবারে চললেন। সেখানে থেকে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে মাড়োয়ারে যাবার কথা। ঠিক সময়ে সবাই মেবারে পৌঁছে চণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে যোধরাও রাজস্বে মুন্দরের কেল্লার দিকে চললেন। যোধরাও তখন ছেলে মানুষ—এক রাত্রে সবাই মাঠের মধ্যে তাঁবু গেড়ে আছেন এমন সময় একটা বুড়ো মাড়োয়ারি যোধরাওর কানে কানে বললে, “দেশে তো এসে পড়েছি, তবে এখন আর চূপ ক’রে থাকা কেন? চলুন, আজ রাত্রেই গিয়ে কেল্লাটা দখল ক’রে বসি, নিজের সিংহাসন পরের কাছ থেকে চেয়ে না নিয়ে জোরসে কেড়ে নেওয়াই ভালো, কি বলেন?” যোধরাও একথায় সায় দিলেন, আশ্বে আশ্বে মাড়োয়ারী সৈন্য সব মুন্দরের দিকে বেরিয়ে গেল।

চণ্ড আর হরোয়া শংকল এ খবর কিছুই জানেন না, সকাল বেলা শিবির থেকে বেরিয়েছেন এমন সময় দেখলেন দূর থেকে এক ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে—তার মাথার পাগড়ি খোলা, বুকের কাপড়ে রক্তের দাগ। সওয়ার যখন ছুটে এসে চণ্ডের কাছে দাঁড়াল তখন চণ্ড তাঁকে নিজের ছেলে কণ্ঠজী ব’লে চিনতে পারলেন। হরোয়া শংকল তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে ঘাসের উপরে শুইয়ে দিলেন, অমনি কণ্ঠজীর প্রাণ বেরিয়ে গেল। কে তাঁকে এমন করে মারল এই দেখবার জন্তে তাঁরা এদিক ওদিক দেখছেন এমন সময় যোধরাও ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বললেন, “প্রভু, আমার অপরাধ যদি হয়ে থাকে তো ক্ষমা করবেন। বাপের সিংহাসন আমি কারু কাছে ভিক্ষা ব’লে চেয়ে নিতে পারলুম না, নিজের জোরে ফৌজ পাঠিয়ে দখল করেছি, লড়াই শেষ হয়ে গেছে। চণ্ডজীর হাতে আমার বাপ পশুর মতো মারা পড়েছে, তারই ধার তাঁর ছই ছেলেকে

যুদ্ধে বীরের মতো মেরে শোধ দিলেম, এতে যদি আমার দোষ হবে থাকে তো শান্তি দিন।”

চণ্ডের মুখে কোনো কথা সরল না। হরোয়া শংকল খানিক ঘাড় হেঁট করে রইলেন, তারপর আন্তে আন্তে বললেন, “যোধরাও, ভুল করেছ, চণ্ডের কোনো দোষ ছিলনা, তুমি বালক ব’লে এবার তোমায় শান্তি দিলেম না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, আর কখনো মেবারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো না! আর এই মাটিতে যেখানে এই বীর কণ্ঠজী পড়ে রয়েছেন এই পর্যন্ত মেবারের রাজ্যের সীমা ঠিক হল, এর পর থেকে তোমার রাজত্ব।”

চণ্ড চোখের জলের মধ্যে দিয়ে দেখলেন যেখানে তাঁর কণ্ঠজী প্রাণশূন্য দেহে পড়ে রয়েছে সেখানে সকালের আলোতে সমস্ত মাঠ জুড়ে সোনার ফুলের মত আঁওলার কচি ফুল ফুটে উঠেছে। তিনি হরোয়া শংকলের দিকে চেয়ে বললেন, “এই আঁওলার ফুলই যেন শান্তির ফুল হয়, যত দূর এই ফুল ফুটবে ততদূর যেন মেবারের রাজ্য এইটেই সবাই বলে। আমার কাজ শেষ হয়েছে, প্রভু আমাকে এখন আপনার সঙ্গী ক’রে লুণী নদীর পারে তপোবনে আশ্রয় দিন।” রাজর্ষি বললেন, “তথাস্তু।”







शुद्धि

2

1



রানা মকুলের দুই খুড়ো ছিলেন—চাচা আর মৈর। যদিও দুজনে রাজার ছেলে, কিন্তু তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে; সেইজন্তে রানাদের চেয়ে তাঁরা মানে খাটো; মেবারের সিংহাসনেও বসবার তাঁদের কোনো উপায় ছিল না। আর সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি—মকুল তাঁদের যথেষ্ট জমিজমা দিয়েছিলেন। মকুলজী যদি তাঁর দুই চাচাকে কেবল রাজসভার শোভামাত্র ক'রে রেখে চুপচাপ থাকতেন, তবে আর কোন গোলই হত না; তাঁ না, একদিন দুই খুড়োকে সাতশ' ক'রে সেপাইয়ের সর্দার বানিয়ে দিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে মকুল রানা একটু মজা দেখতে চাইলেন।

খুড়ো দুজনের কাজের মধ্যে ছিল দিবারাত্রি আফিং খেয়ে ঝিমোনা। হঠাৎ সর্দার বোনে গিয়ে লড়াইয়ে যেতে হলে, তাঁরা না-জানি কি বিপদেই পড়বেন—কোথায় থাকবে আফিং, কোথায় বা তামাক? দুধের পুরু সর, রাবড়ি, মালাই সেখানে তো পাওয়াই যাবে না; উল্টে বরং মাঠের হিম খেয়ে মরতে হবে!—মাদেড়িয়ার ভীলদের হাঙ্গামা মেটাতে গিয়ে মকুল এই তামাশা দুই খুড়োকে নিয়ে শুরু করলেন। অনেক দিন বেশ আমোদে কাটল। তামাশার সঙ্গে সাতশ' সেপাইয়ের সর্দারের মাসোহারা যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ভাইপোটিকে আমোদ দিতে দুই খুড়োর আপত্তি হল না; কিন্তু ঠাট্টা-তামাশা ক্রমেই একটু কড়া-রকম হতে লাগল। এমন কি, আফিংচি হলেও তামাশার খোঁচার দিকে চোখ বন্ধ ক'রে ঝিমোন দুই খুড়োর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। কিন্তু ভাইপোর অনুগ্রহ ছাড়া বেচারাদের পেট চলবার অন্য উপায় ছিল না; কাজেই মনের রাগ তাঁদের মনেই জমা হতে লাগল; আর কোনো-কোনো দিন মুখ ফসকে বেরিয়েও আসতে শুরু করলে! এতে মকুলজীর আমোদ আরো বেড়ে চলল বই কমল না। লোককে নিয়ে তামাশা করার নেশা লখারানার মতো মকুলেরও কম ছিল না। একদিন দুই

চাচা তাঁকে স্পষ্ট মুখের উপর শুনিতে দিলেন যে বাপের তামাশার ফলে তিনি যে সিংহাসন পেয়েছেন, নিজের তামাশার দোষে সেটা কোনদিন বা তাঁকে হারাতে হয় ! চাচার মনের কথা এমন স্পষ্ট শুনেও মকুলের চোখ ফুটল না । খুড়োদের ক্ষেপিয়ে তিনি তামাশা ক'রেই চললেন ।

সেদিন বনের মধ্যে একটা গাছে হঠাৎ রাত্রে মধ্যে রাঙা ফুল এত ফুটে উঠেছে যে মনে হচ্ছে বনে কে আগুন ধরিয়ে গেছে ! মকুল সেই গাছটা দেখিয়ে পাশের একজনকে গাছের নামটা শুধোলেন । সে ঘাড় নেড়ে বললে, “গাছের খবর আমরা রাখিনে রানাসাহেব !” মকুল তাঁর দুই খুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, “গাছটার নাম কি আপনারা জানেন চাচা ?” শাদা কথা । কিন্তু দুই খুড়ো বুঝলেন, তাঁদের মা ছিলেন কাঠুরের মেয়ে, কাজেই গাছের খবর তাঁদেরই কাছে পাওয়া সম্ভব—এইটেই রানা ইসারার জানালেন । মা যেমনই হোক, সে তো মা, তাঁকে নিয়ে তামাশা কোন ছেলে সইবে ! সেইদিনই দুই খুড়ো মকুলের কাজে ইস্তফা দিয়ে সভা ছেড়ে শুকনো মুখে বিদায় হয়ে গেলেন । রানার দেওয়া সাজসজ্জা, অস্ত্র-শস্ত্র, টাকা-কড়ি, লোক-লস্কর, হাতি-ঘোড়া সব পড়ে রইল ; কেবল একটি মা-হারা মেয়ে, যাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে দুই ভায়ে আপনাদের সব ভালোবাসা দিয়ে পুষেছিলেন, তাকেই কোলে ক'রে সেপাই সর্দার সবার মাঝখানে দিয়ে মাথা নিচু ক'রে চলে গেলেন— একেবারে বন ছেড়ে ।

দুই খুড়োর উপর কতটা অগ্নায় হয়েছে, মকুল তখন বুঝলেন । মাপ চেয়ে দুই খুড়োকে ফিরিয়ে আনতে লোকের পর লোক গেল, কিন্তু দুইখুড়ো আর ফিরলেন না । অমৃতাপে মকুল সারাদিন দুঃখ পেতে থাকলেন । নিতান্ত ভালোমানুষ, নিকরপায় দুই খুড়োর শুকনো মুখ তাঁকে আজ কেবলি ব্যথা দিতে লাগল । তিনি সন্ধ্যাবেলা শিবির ছেড়ে একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন । সর্দারেরা রানার মনের অবস্থা বুঝে কেউ আজ

যেতে সাহস পেল না। সবাই তফাতে-তফাতে রইল। বনের তলায়  
 আঁধার ক্রমে ঘনিয়ে এল, আকাশে আর আলো নেই, এ-সময়ে যখন  
 চারিদিকে বিদ্রোহী ভীল, তখন রানাকে আর বনের মধ্যে একা থাকতে  
 দেওয়া উচিত হয় না ভেবে যখন সব সর্দার বনের দিকে এগিয়ে চলেছেন,  
 সে সময়ে মনে হল যেন অনেক শুকনো পাতা মাড়িয়ে অন্ধকারে কারা  
 ছুটে পালাল। তারপরেই সর্দারেরা দেখলেন, সেই রক্তের মতো রাঙা  
 ফুলগাছের তলায় রানা মকুল পড়ে রয়েছেন; বুকের দুই-দিকে দুটো  
 বল্লমের চোট দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রানা সন্ধ্যার মালাজপ করছিলেন,  
 এখনো তাঁর ডান-হাতের আগায় সেই মালা জড়ান। রানার মতো  
 রানা ছিলেন মকুল—মেবারে হাহাকার পড়ে গেল! সবাই বলতে  
 লাগল, একাজ সেই দুটো খুড়োর না হয়ে যায় না! মাদেরিয়ার বনে  
 বিদ্রোহীদের কেউ এসে যে রানাকে মেরে যেতে পারে এটা সবার  
 অসম্ভব বোধ হল।

পায়ীগ্রাম থেকে একটু দূরে পাহাড়ের উপরে রাতকোটের কেল্লা। সেই-  
 খানে এ-গ্রাম, সে-গ্রাম ঘুরে চাচা আর মৈর অতি কষ্টে এসে পৌঁছলেন।  
 ওদিকে মকুলের উপযুক্ত ছেলে রানা কুম্ভ, তাঁর সঙ্গে মাড়োয়ারের  
 যোধরাও এসে মিলেছেন; গ্রামে গ্রামে, পরগণায় পরগণায় তাঁদের  
 লোক চাচা মৈর—দুই ভাইকে ধরবার জন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পায়ীগ্রাম  
 চিতোর থেকে বহুদূরে। ক-ঘর ছুতোর-কামার জনকতক জোতদার-  
 কিষাণ, বেশীর ভাগই গরীব-গুর্বোঁ। চাচা আর মৈর দুজন সর্দার তাদের  
 মধ্যে এসে ভাঙা কেল্লাটা দখল ক'রে ধুমধাম লাগিয়ে দেওয়াতে প্রথমটা  
 তারা খুব খুশী হল। প্রথম-প্রথম দু-একবার তাদের সবারই পালে-  
 পার্বণে কেল্লাতে নিমন্ত্রণ, আনাগোনাও হল; কিন্তু যতই টাকার  
 টানাটানি হতে লাগল, ততই দুই সর্দারের হাত গোটাতে লাগলেন।  
 শেষে এমন দিন এল যে, দুই সর্দারের কথা কেউ আর বড় একটা মুখেই

আনিত না। আবার পাহাড়ের উপর ভাঙ্গা কেঁলার ছই বুড়োর নামে  
মানা-রকম গুজব রটতে লাগল। কেউ বললে, তাদের অনেক টাকা ;  
কেঁলার মধ্যে তারা সেই সব ধন-দৌলত এনে পুত্তে রেখেছে ; রোজ  
তিনটে রাতে পাহাড়ের একটা দিকে কে যেন লঠন নিয়ে উঠছে সে  
স্বচক্ষে দেখেছে। কেউ বললে, ছই সর্দার কেঁলার মধ্যকার একটা স্ফুড়ঙ্গ  
দিয়ে দিল্লী যাওয়া-আসা করে, নবাবও মাঝে-মাঝে কেঁলায় এসে নাচ-  
তামাশা খাওয়া-দাওয়া করেন, তার ভাই একদিন হাট সেরে ফেরবার  
সময় সারঙ্গীর আওয়াজ আর মেয়েমানুষের গান স্পষ্ট শুনেছিল। একজন  
কামার কবে কেঁলার ছই-একটা মর্চে-ধরা দরজার খিল মেরামত ক'রে  
এসেছিল, সে বললে, স্বচক্ষে দেখে এসেছে, ছই বুড়োতে একটা  
আগুনের উপরে লোহার কড়া চাপিয়ে মুঠো-মুঠো লোহা-চুর ফেলছে,  
আর সেগুলো সোনা হয়ে উথলে পড়ছে। কড়াখানা কিন্তু মানুষের টাটকা  
রক্তে ভরা ; ছটো কালো বাঘ সেই কড়াখানার চারিদিকে কেবলি মাটি  
শুকুকে শুকুকে ঘুরছে।

রাতকোটের কেঁলা ক্রমে নানা আজগুবি ভয়ংকর কাণ্ডের, ভয়ের আর  
তরাসের জায়গা ব'লে রটে গেল। ভয়ে সেদিক দিয়ে লোকে আনা-  
গোনাই আর করত না, দিনে-দুপুরে যেন তারা বাঘের গর্জন শুনতে  
থাকল, আর সন্ধ্যার সময়ে দেখতে লাগল—যেন কারা ঘোড়ার পিঠে  
থলে বোঝাই টাকা নিয়ে চলেছে—ঝম ঝম।

ছই সর্দার মাসে-ছমাসে একবার হাটে নেমে আসতেন, কাপড়-চোপড়  
আটা গম একটা খোঁড়া ঘোড়ার পিঠে বোঝাই দিয়ে আবার পাহাড়ের  
উপর কেঁলায় উঠে যেতেন। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে সারা-গ্রাম হস্তা-  
খানেক ধরে সরগরম থাকত। সে নানা কথা—আটাওয়াল ছই  
বুড়োকে আটা বেচে টাকার বদলে মোহর পেয়েছে, ঘি দশ সের, তার  
দাম কতই বা ? বুড়োদের ঘি বেচার পরদিনই গোয়ালার স্ত্রীর গলায়

হঠাৎ রূপোর হাঁসুলিটা দেখা যায় কেন ? আর সেই কাপড়ের মহাজন, তার দোকান থেকে ছুটো বুড়ো কেন যে এত সাড়ি কেনে, সেটা প্রকাশ হয়েও হচ্ছে না, সে কেবল মহাজনটা রীতিমতো কিছু মেরেছে ব'লে ! এদিকে গ্রামের ঘরে-ঘরে এই চর্চা, ওদিকে পাহাড়ের উপরে ছুই বুড়োতে সেই কুড়োনো মেয়েকে তাদের সব ভালোবাসা দিয়ে আদর-যত্নে মানুষ করছে। মেয়েটি তাদের প্রাণ। সেই ভাঙ্গা কেলা, সেই মেয়ের হাসিতে, তার কচি গলার মিষ্টি কথায়, পাপিয়ার মতো তার গানের সুরে, দিন-রাত ভরে রয়েছে। তার হাতে-লাগান ফুলের লতা ভাঙা দেয়াল বেয়ে উঠে সকালে-সন্ধ্যায় ফুল ফোটাচ্ছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে রাজার ভয়ে দেশ-ছাড়া এই দুটি বুড়োর জন্তে। একলা কেলায় এই তিনটি প্রাণী। আর আছে—এক পাহাড়ি কুকুর, দেখতে যেন বাঘ। সেই কুকুরই চাকর, দরওয়ান, সান্দ্রী, পাহারা—সব। অজানা লোক যে হঠাৎ কেলায় ঢুকবেন, তার জো নেই ! শঙ্খচিল যেমন পাহাড়ের চূড়ায় বাসা বেঁধে বাচ্ছা নিয়ে থাকে, তেমনি শাদা-চুল ছুই বুড়োতে সেই অগম্য পুরীতে আদরের মেয়েকে নিয়ে রয়েছেন—অনেকদিন ধরে। এমন সময় একদিন পার্বীগ্রামের দফাদারের সুন্দরী মেয়েটি হারাল। নদীতে ডুবে সে মরল, কি বাঘেই তাকে ধরলে কিছুই ঠিক হলনা। কিন্তু সবাই ঠিক করলে যে ঐ বুড়ো সর্দার-ছুটো সুন্দরী দেখে মেয়েটিকে চুরি করছে। মেয়ের বাপ, পাগলের মতো হয়ে, কাজ-কর্ম ছেড়ে দিনরাত রাতকোটের কেলায় আশে-পাশে ঘুরতে লাগল। তার নিশ্চয় বিশ্বাস সুন্দরীয়া তার ঐ কেলাতেই আছে। কেননা একদিন সকালে সত্যিই সে একটি মেয়েকে এলোচুলে পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে বেড়াতে দেখেছে—খুব দূর থেকে যদিও, কিন্তু সে যে তারই মেয়ে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দফাদারকে সবাই পরামর্শ দিলে, “যাও, রানা কুন্তের কাছে নালিশ কর গিয়ে। তোমার মেয়েটি যে-ভয়ানক লোকদের হাতে

পড়েছে, কুস্ত ছাড়া কার সাধ্য নেই তাকে ছাড়িয়ে আনে।” বুড়ো দফাদার চলল। মরচে-ধরা তলোয়ার কোমরে বেঁধে, আর নিজের চেয়ে একটু বুড়ো এক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে একলা চিতোরের দিকে দফাদার চলল।

রাতকোট থেকে চিতোর কত দিন-রাতের পথ, তা কে জানে দফাদার কিন্তু চলেছে। মেয়ের শোকে পাগলের মতো চলেছে; আর ফিরে-ফিরে রাতকোটের কেলাটার দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে গালাগালি পাড়ছে; এমন সময় পথের মধ্যে তিন ঘোড়-সওয়ারের সঙ্গে দেখা। কথায়-কথায় দফাদারের মুখে মেয়ে-চুরির খবর শুনে তিন জনেই বললে, “চল, দফাদার-সাহেব, এর জন্তে আর রানার কাছে যেতে হবে না। আমরাই তোমার মেয়েকে উদ্ধার ক’রে সেই দুই বুড়োর দফা রফা ক’রে আসছি, চল।” শুনে দফাদার ঘাড়-নেড়ে বললে, “চেননা সেই দুই বুড়োকে, তাই এমন কথা বলছ! মানুষের অগম্য স্থানে থাকে তারা! যদি কেউ সে-কেলা মারতে পারে তো রানা কুস্ত! পাহাড় বেয়ে সেখানে উঠতে হবে—রাস্তা নেই। বনে-জঙ্গলে দিনে বাঘ হাঁকার দিয়ে ফেরে। কেউ সেখানে যেতে পারে না; আর গেলেও ফিরতে পারে না। এমনি ভয়ানক পাহাড়ের চূড়ায় রাতকোটের কেলা! আর তারই মধ্যে রাক্ষসের চেয়ে ভয়ানক দুই বুড়ো বসে!” বলেই দফাদার হাউহাউ ক’রে মেয়ের জন্তে কাঁদতে লাগল। তিন সেপাইয়ের মধ্যে সব-ছোট যে সেপাই, সে বললে, “ভয় নেই, আমরা ঠিক সেখানে যাব, চলে এস।” ছোট সেপাইয়ের কথা শুনে দফাদার একটু চটে বললে, “আমার কথায় বিশ্বাস হল না? আমি বলছি, সেখানে যাবার রাস্তা নেই।” ছোট সেপাই আর কেউ নয়, রানা কুস্ত নিজে। চাচা আর মৈরকে সন্ধান ক’রে শান্তি দিতে চলেছেন। দফাদারের কথায় রানা হেসে বললেন, “কেউ যদি কেলায় উঠতেই পারে না, তবে বুড়ো-দুটো তোমার মেয়েকে নিয়ে

সেখানে গেল কোথা দিবে ? রাস্তা নিশ্চয়ই আছে।” দফাদার আরো  
রেগে বললে, “ওহে ছোকরা, রাস্তা থাকলে আমি কি সেখানে না উঠে  
এদিকে আসি ? নিজেই গিয়ে বদ্‌মাস-ছটোর মাথা কেটে আমার  
মেয়েকে—” ব’লেই বুড়ো আবার কাঁদতে লাগল। তিন সিপাই তাকে  
ঠাণ্ডা ক’রে পায়ীগ্রামে ফিরিয়ে আনলেন।

গাঁয়ের মধ্যে সামান্য সেপাই-বেশে দফাদারের সঙ্গে রানা কুস্ত যখন  
উপস্থিত হলেন, তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে—আকাশে কালো মেঘ জমে  
ঝড়বৃষ্টির উপক্রম হচ্ছে। গাঁয়ে এসে রানা খবর পেলেন, কেল্লার উপরে  
য়ে বুড়োছটি আছেন, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর বাপের খুড়ো—চাচা আর মৈর।  
রাগে কুস্ত লাল হয়ে উঠে বললেন, “চল, আর দেবী নয়’ এখনি সেই  
ছটো পাপাত্মার উচিত শাস্তি দেব।” রানা কেল্লার মুখে ঘোড়া  
ছোটালেন দেখে সঙ্গের ছটা সেপাইও চলল—পিছনে। দফাদার  
অন্ধকারে খানিক ওদের দিকে হাঁ-করে চেয়ে থেকে, ‘পাগল ! পাগল !’  
ব’লে ঝড় নাড়তে-নাড়তে নিজের বাসায় খিল দিলে। সোঁ-সোঁ ঝড়  
বহঁতে লাগল আর তার সঙ্গে বৃষ্টি নামল। এক-একবার বিদ্যুৎ  
চমকাচ্ছে তারই আলোর দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের উপর রাতকোটের  
কেল্লা—কালো অন্ধকারের একটা ঢেউ যেন আকাশ জুড়ে স্থির হয়ে  
রয়েছে। ভিজ়ে মাটিতে তিনটে ঘোড়ার, পায়ের ছপ-ছপ শব্দ হতে  
থাকল। রানা বললেন, “ঘোড়া এইখানে ছেড়ে, পায়ের হেঁটে চল।”  
বনের মাঝে ঘোড়া বেঁধে তিন সেপাই পাহাড়ে চড়তে শুরু করলেন।

এদিকে পাহাড়ের উপরে ভাঙ্গা কেল্লায় ছটি বুড়ো আর তাঁদের সেই  
কুড়োনো মেয়েটি একটি পিদিমের একটুখানি আলোর মস্ত-একখানা  
অন্ধকারের মধ্যে বসে গল্প করছেন : আর কেল্লার ফাটকে সিংহের মতো  
কটা চুল প্রকাণ্ড শিকারী কুকুর হিঙ্গুলিয়া ভাঙ্গা দরজার চৌকাঠে মস্ত  
থাবা ছটো পেতে মুখটি বাড়িয়ে ছুই কান খাড়া ক’রে বাইরের দিকে

চেয়ে রয়েছে— কেউ আসে কি না ! ভিজ়ে বাতাসে শিকারী কুকুরের  
 কাছে রাতে-ফোটা একটা বনকুলের গন্ধে ভেসে এল ; তার পরেই কাদের  
 পায়ের তলায় বনে কুটো-কাটা ভাঙার একটুখানি শব্দ হল । কুকুর গা  
 ঝাড়া দিয়ে উঠে আস্তে আস্তে বার হল—জঙ্গলের পৃথে । বনের মধ্যে  
 ভিজ়ে পাহাড়ের তাত উঠেছে । অন্ধকারে ছু-চারটে জোনাকিপোকা লঠন  
 জালিয়ে কি যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে ! কুকুর পাহাড়ের পাকদণ্ডির ধারে  
 চুপটি ক'রে গিয়ে দাঁড়াল । রাতের বেলায় অচেনা কাদের পায়ের শব্দ  
 শুনে শিকারী কুকুরের চোখ দুটো জ্বলছে । কুকুর সজাগ হয়ে বসে আছে ।  
 কিন্তু যারা পাহাড়ে উঠছে, তারাও কম সজাগ নেই—পাকা শিকারী,  
 পাকা যোদ্ধা রানা কুম্ভ, তাঁর চারণ, আর মাড়োয়ারের যোধরাও !  
 জানোয়ারের চোখ জ্বলছে কোন ঝোপের আড়ালে, সেটা এরা জোনাকির  
 আলো ব'লে ভুল করলে না । রানার হাতের ছুরি সাঁ-ক'রে গিয়ে  
 বিঁধল হিঙ্গুলিয়ার বিখাসী প্রাণটি ধুক-ধুক করছে ঠিক যেখানে !  
 শিকারীর ছুরিতে কেবল একটা মাত্র রক্ষক, দুটি বুড়ো একটি কচি  
 মেয়ের একমাত্র বন্ধু আর বিপদের সহায়—সেই সিংহের মতো হিঙ্গুলিয়া  
 মরল—একটিবার কাতর স্বরে ডাক দিয়ে । সে যেন ব'লে গেল—  
 “সাবধান !” ঝড়ের বাতাসে সেই শেষ-ডাক ছেড়ে দিয়ে কুকুর শুরু হল ।  
 রানার বড় স্ফুর্তি হয়েছিল যে তিনি কেবল নেবার মুখেই একটা মস্ত  
 সিংহ শিকার করলেন । সঙ্গীরাও বললেন, “রানা, এ বড় সুলক্ষণ !”  
 কিন্তু সেই ডাক যখন অন্ধকার চিরে পাহাড়ের চূড়ায় কেবলার দিকে  
 একটা কান্নার মতো ছুটে গেল, তখন সবার মুখ চুন হয়ে গেল ! দেখলেন  
 একটা কুকুর পড়ে আছে । তিনজন আস্তে আস্তে আবার চললেন ।  
 মনে কারু আর তেমন উৎসাহ রইল না ।

ওদিকে সেই আঁধার ঘরের একটি পিদিম বাতাসে নিবু-নিবু করছে ;  
 তাকেই ঘিরে তিনটি প্রাণী । বুড়ো চাচা গল্প বলছেন ; তাঁর ছোট ভাই—



আর এক বুড়ো ছেঁড়া কাঁথায় বলে ঝিমছেন, আর মেয়েটি অবাক হয়ে  
 শুনছে : “আমরা দুই ভাই তখন খুব ছোট। আমি চলতে শিখেছি  
 আর ও তখন মায়ের কোলে কোলেই ফেরে। মা আমার হাত ধরে  
 চলেন—এতটুকু ওকে বুকে ক’রে। গাঁয়ের সবাই বলতে লাগল,  
 দুই কাঠুরের মেয়ে, কবে রানা ক্ষেতসিং তোকে বিয়ে করেছেন, তা কি  
 তাঁর মনে আছে ? মিছে চিত্তোরে যাওয়া ! মা ঘাড় নাড়লেন। তারপর  
 আমরা ঘর ছেড়ে বার হলেম। আমাদের সেই ছোট ঘরখানি, সেই সবুজ  
 মাঠের ধারে সেই মস্ত তেঁতুল-তলার দিকে চেয়ে আমার মনটা কেমন  
 কেমন করতে থাকল। আমি কেবলি ঘরের দিকে ফিরে চলতে  
 চাইলেম ! মা কিন্তু আর সেদিকেও চাইলেন না—সোজা চললেন  
 আকাশ যেখানে মাটিতে এসে মিলেছে, বরাবর সেই দিকেই চেয়ে।  
 সন্ধ্যা হলে পথের ধারে কোনো দিন গাছতলায়, কোনো দিন খোলা  
 মাঠে মা আমাদের নিয়ে রাত কাটান। সকালে আবার চলতে আরম্ভ  
 করেন। দুপুরে কোনো দিন কোনো গাঁয়ে আসি, যেখানে যা ভিক্ষে পাই,  
 তাই খাই। কোনো দিন বা কিছু পাইও না, খাইও না। এই ভাবে মা  
 আমাদের চলেছেন—চিত্তোরের রানার দুঃখিনী কাঠকুড়োনি রাণী !  
 কতকাল পথে-পথে কাটল তার ঠিক নেই। সারা বর্ষা চলে গেল—  
 ভিজতে ভিজতে পথ চলতে-চলতে। শীত এল। মাঠের ছুরস্ত বাতাস  
 রাতের বেলায় গায়ে যেন বরফ ঢেলে দিতে লাগল। ছেঁড়া কাঁথায়  
 আমাদের জড়িয়ে নিয়ে মা সারারাত কাঁদতেন আর জাগতেন। আমাদের  
 দুঃখিনী মা—রাণী মা ! আমি এক একদিন বলতেম, মা, ঘরে চল। মা  
 বলতেন, আর একটু গেলেই ঘর পাব। আমি সামনের দিকে চেয়ে  
 দেখতেম, দূরে কেবল একটা ঝাপসা পাহাড়ের ঠাণ্ডা নীল ঢেউ ! মা সেই  
 নীলের দিকে চেয়ে চলতেন, আর এক একবার তাঁর চোখ দিয়ে ঝর-ঝর  
 ক’রে জল পড়ত। এমনি সে কত দিন, কত দূর চলে একদিন

আকাশে আজকেরই মতো বাদল লাগল, বাতাস বইল, বিহ্বল  
 চমকাল; মেঘের ছায়া পড়ে সামনের পাহাড় সে দিন যেন কালো  
 হয়ে কাছে এগিয়ে এসেছে বোধ হল। মা আমার পথের ধারে চূপটি  
 ক'রে ঘুমিয়ে ছিলেন, আমি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেম, মা, চেয়ে দেখ  
 পাহাড়ের উপর কত বড় বাড়ি! মা এক বার চোখ মেলে দেখে বললেন,  
 ওই আমার ঘর! খানিক পরে আশ্চর্য-আশ্চর্য আমার বুকের কাছে টেনে  
 নিয়ে একটি সোনার হার আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'রানাকে  
 এইটে দেখাস, তিনি তোদের ঘরে ডেকে নেবেন।'

বুড়ো চাচার চোখে জল ভরে উঠল। মেয়েটি বললে, "তার পর?  
 কি হল?" কারো মুখে কথা নেই। অনেকক্ষণ পরে চাচা উত্তর দিলেন,  
 "তার পর আর কি? রাজার রাজা যিনি, তিনি আমার দুঃখিনী মাকে  
 ডেকে নিলেন—নিজের ঘরে!" "আর তোমাদের?" মেয়েটি শুধোলে।  
 চাচা আশ্চর্য বললেন, "আমরা গেলাম রানার সঙ্গে দেখা করতে।  
 সেখানে কত কাল কাটালেম অুখে-দুঃখে দুই ভাই একলা! অত বড়  
 রাজবাড়ি, সেখানে মাকে কোথায় খুঁজে পাব? দুজনে একলা থাকি  
 আর মায়ের জন্তে কাঁদি—"

মেয়েটি ভারি ব্যস্ত হয়ে শুধোলে, "রানার ঘরে মাকে পেলেন না?" চাচা  
 ঘাড় নাড়লেন, "না।" কোথায় যে গেলেন মা, তা কেমন ক'রে  
 জানব? সে অনেক দিন পরে, দুই ভাই যখন বুড়ো হয়েছি, তখন এক  
 দিন সকালে উঠে রাজসভায় যাব, এমন সময় দেখলেম, পথের ধারে মা  
 আমাদের এতটুকু একটি কচি মেয়ে হয়ে, একলাটি দাঁড়িয়ে ঘরে যাব  
 ব'লে কাঁদছেন। আমরা সেই অনেক দিনের হারান মাকে ফিরে পেয়ে  
 কোলে ক'রে একবারে ঘোড়া হাঁকিয়ে এই পাহাড়ে এসে উপস্থিত  
 হলেম।" মেয়েটি শুধোলে, "রানা আবার কাঠকুড়োনি রানীকে কেড়ে  
 নিতে এলেন না?" চাচা, মৈর দুজনেই ব'লে উঠলেন, "খুঁজে পেলেন

তো রানা ? আমরা এমন জায়গায় মাকে লুকিয়ে রেখেছি, রানার সাখি  
 কি, সেখান থেকে মাকে খুঁজে বার করেন !” গল্প শুনতে শুনতে  
 মেয়েটির চোখ ঘুমিয়ে পড়ছিল। সে চাচার কোলে মাথা রেখে বললে,  
 “আমাকে এক দিন তোমাদের মাকে দেখাবে ?” চাচা আশ্তে মেয়েটির  
 চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, “আর একটু বড় হও, তার পরে সেই  
 নিরীলা ঘরে একটি পিদিম জালিয়ে মা যেখানটিতে একলা বসে আছেন,  
 সেখানে আমরা সবাই মিলে চুপি চুপি চলে যাব।” মেয়েটি ঘুমের  
 ঘোরে দরজার দিকে চেয়ে বললে, “হিজুলিয়া ?” চাচার ভাই আফিমের  
 ঝোঁকে মাথা ছুলিয়ে বললেন, “হাঁ, হাঁ, সেটাকেও সঙ্গে নিতে হবে।”  
 যারা গল্প বলছিল, আর শুনছিল, সবাই আশ্তে-আশ্তে ঘুমিয়ে পড়ল।  
 জেগে রইল কেবল একটি পিদিমের আলো—অন্ধকারের মাঝে যেন  
 কষ্টিপাথর-ঘসা একটুখানি সোনালি রঙ।

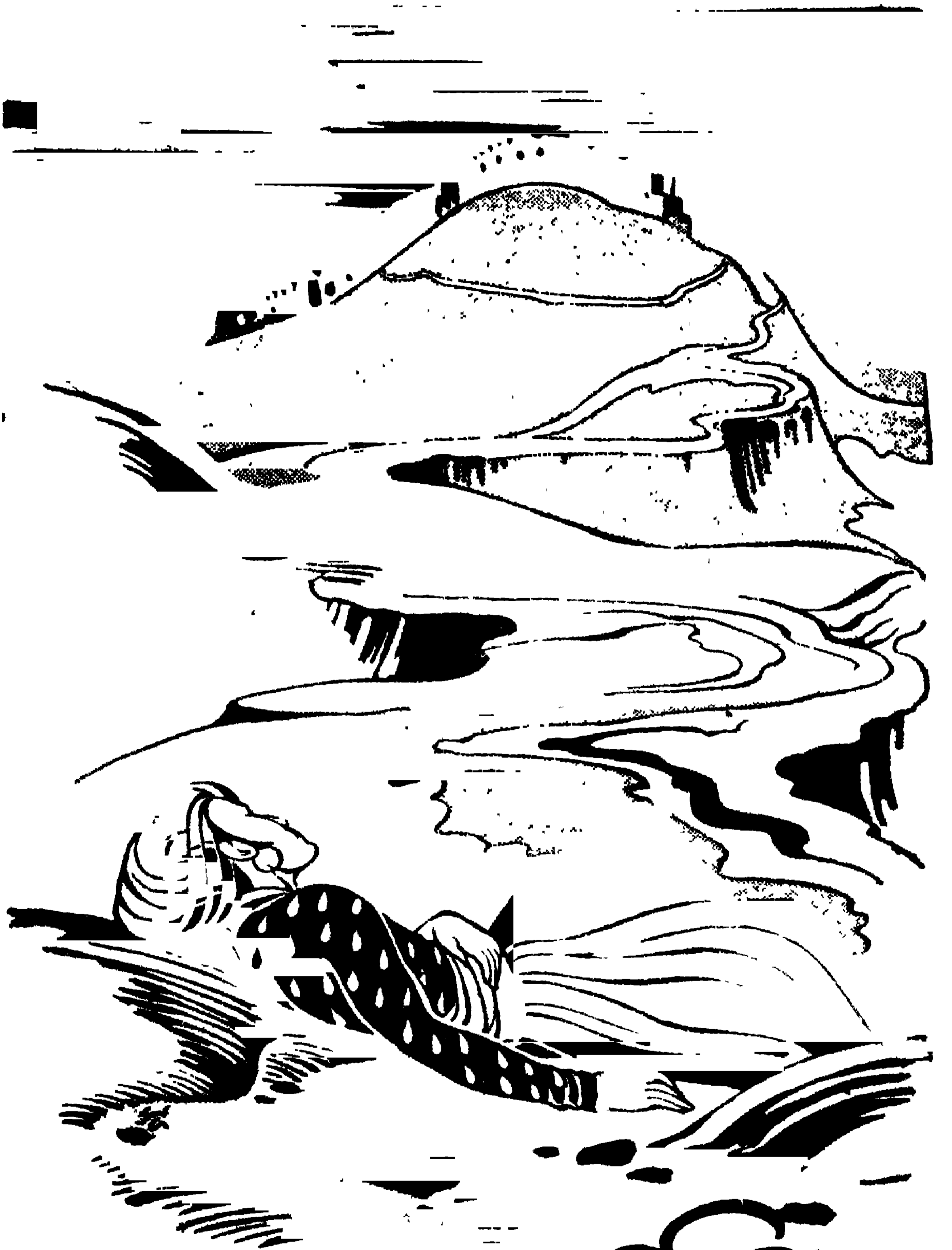
কোনু সময়ে ঝড়-বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ জানে না ; কখন রানা  
 কুন্ত তলোয়ার খুলে ঘরে ঢুকেছেন, হঠাৎ একটা মেঘগর্জনের সঙ্গে কড়-  
 কড়্ ক’রে বাজ পড়ল। তিনজনেই চমকে উঠে দেখলেন তিনখানা খোলা  
 তলোয়ার মাথার উপরে ঝক্ঝক্ করছে। রানা কুন্ত ডাকলেন, “ওঠো !”  
 দুই বুড়োতে উঠে দাঁড়ালেন—মেয়েটির হাত ধরে। কুন্ত গম্ভীর হয়ে  
 বললেন, “রানাকে খুন করেছ, রাজপুত্রের মেয়েকে চুরি ক’রে পালিয়ে  
 এসেছ, এর শাস্তি আজ তোমাদের নিতে হবে !” চাচা অবাক হয়ে  
 বললেন, “রানাকে ?” মৈর আশ্তে-আশ্তে বললেন, “মকুলজীকে ?” কুন্ত  
 বললেন, “হাঁ, তারই খুনের শাস্তি এই নাও !” দুখানা তলোয়ার একই  
 সঙ্গে দুই বুড়োর মাথায় পড়ল। মেয়েটি ‘মা !’ ব’লে একবার ডেকে  
 অজ্ঞান হল। ঝড়ের বাতাস কোথা থেকে হঠাৎ এসে ঘরের পিদিম  
 নিবিয়ে দিলে। কুন্ত জানলেন, তাঁর বাপের খুনের শাস্তি দিলেন, রাজ-  
 স্থানের সবাই জানলে তাই, কেবল ক্ষেতসিংহের কাঠকুড়োনি রাণীর দুই

ছেলে, বাঁদের মাথা কাটা গেল, তাঁরাই জানলেন না, কেন রানা তাঁদের শাস্তি দিলেন। আর সেই মেয়েটি জানলে না, দফাদারের ঘরে রাতারাতি কারাই বা তাকে রেখে গেল, আর কেনই বা সকালে গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে বলাবলি করলে—এ-তো নয়, সে-তো নয়! এমনি নানা কথা ক'য়ে সবাই মিলে সন্ধ্যা-বেলা গাঁয়ের বাইরে, মাঠের ধারে কেন যে তাকে একা বসিয়ে দিয়ে সবাই যে-যার ঘরে চলে গেল, আর কেনই বা সারা রাত চাচা, চাচা, হিঙ্গুলিয়া, হিঙ্গুলিয়া ব'লে কেঁদে ডাকলেও কেউ সাড়াশব্দ দিলে না, আর সেই রাতকোটের কেমন অন্ধকারে কোথায় যে হারিয়ে গেল, খুঁজে-খুঁজে চলে-চলে পা ধরে গেল, তবুতো আর সেখানে সে ফিরতে পারলে না!—কেন? কেন?

তারপরে রানা কুন্ত চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রাণী মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমন। রতিয়া-রানার মেয়ে মীরা। তাঁর গান শুনে, রূপ দেখে রানা কুন্ত তাকে বিয়ে করলেন। রাণী স্বামীর সেবা করেন, কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে—রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরে বাঁশি-হাতে কালো পাথরের দেব-মূর্তির পায়ে কাছে। রানার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে—এই চান রানা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, “মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!” চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারি লজ্জার কথা হলে উঠল। রানা হুকুম দিলেন, “মন্দিরে বাইরের লোক আসা, বন্ধ কর।” এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু তাঁর গানের সুর শুনতে কানাতে বাইরে দেশ-বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি শুনে হরিণ যেমন, তেমনি সবাই এক-মনে কান-পেতে প্রাণ-ভরে মীরার গান

শুনতে থাকে—তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না, কাউকে মানেও না। জোছনা-রাতে মন্দিরের সামনে খেত-পাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে-জড়ান সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছে, গাইছে, রানা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভীড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো একগাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রানা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। মীরা সেই অমূল্য হার নিজের গলা থেকে খুলে মন্দিরের মধ্যে বংশীধারী রণ্ছোড়জীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে-রাতের মতো গান বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ বললে 'কে-এক উদাসীন, কেউ বা আরো কত কি! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রানাকে না দিয়ে যে রণ্ছোড়জীকে নিবেদন ক'রে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশী হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে। কিন্তু কুন্তু-রানা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, “এবারে ভক্তেরা আত্মন মন্দিরে আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্তরে।” এই হুকুম দিয়ে রানা মহম্মদ খিলিজির সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল। মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্তরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে-আনা ফুলের মতো মীরা দিন-দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় একদিন যুদ্ধ জয় ক'রে ধুম-ধামে মহারানা চিতোরে এলেন। মামুদ-সাকে তাঁর মুকুটের সঙ্গে রানা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলে। কিন্তু মীরার মন রানা জয় করতে পারলেন না। মীরা বলেন, “রানা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ করনা। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন—‘মীরা আর!’ আমাকে





ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ





রানা কুস্ত অনেক লড়াই করেছিলেন, অনেক দেশও জয় করে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন, কিন্তু খুনখুনের লড়াই যেমন, তেমন আর কোনো লড়াই হল না। আর লড়াই ফতে হবার পরে নাচ-তামাসা, গান-বাজনা, আতসবাজি আলো যেমন হতে হয়! একমাস ধরে চিতোর শহর রাতে দিন হয়ে গেল। কিন্তু একটি কাণ্ড ঘটল। লড়াই জিতে আসার পরদিন থেকে কুস্ত হাতের তলোয়ার তিনবার মাথার উপর ঘুরিয়ে ফাসি না আরবীতে কি জানি কি সাপের মস্তুর না ব্যাঙের মস্তুর আউড়ে তবে নিজের সিংহাসনে বসতে লাগলেন। শুধু এক-আধ দিন নয়, এই কাণ্ড বরাবর চলল। রানা বুড়িয়ে গেলেন তবু তলোয়ার ঘোরান আর মস্তুর পড়া একটি দিন কামাই গেল না। রানার কাণ্ড দেখে সভাসুদ্ধ অবাক হয়ে যেত, কিন্তু কেন যে রানা এমন করেন সে কথা জানতে কেউ চেষ্টাও করত না। একবার রানার বড় ছেলে সভার মাঝে রানাকে শুধিয়েছিলেন—মাথার উপরে তিনবার তলোয়ারখানা ঘোরাবার কারণটা কি আর ওই সাপের মস্তুর গুলোরই বা মানে কি? সেইদিন রানা কুস্ত জবাব দিলেন, “বারো ঘণ্টার মধ্যে চিতোর ছেড়ে চলে যাও, বাপ কি করেন, না করেন, সে খোজ ছেলের রাখবার কিংবা জানবার দরকার নেই।” তারপর তিনবার করে ঠিক নিয়মিত রানার তলোয়ার মাথার উপরে ফিরতে লাগল কিন্তু হুকুম আর ফিরল না। রানার বড়-ছেলে রায়মল নির্বাসনে গেলেন, রইলেন কেবল ছোট-ছেলে পুরজমল আর মেজ-ছেলে—তার নাম রাজস্থানে কেউ এখনো করে না—‘ঘাতীরাও’ ‘হাতিয়ারো’ এমনি নানা নামে সে লোকটাকে ডাকে। এই ‘ঘাতীরাও’ বিষ খাইয়ে বুড়ো রানা কুস্তকে মেরে চিতোরের সিংহাসনে বসল। রাজপুত প্রজারা এই বিষম ঘটনায় একেবারে খাপ্পা হয়ে খুনের শোধ খুনই ঠিক ব’লে স্থির করে রায়মলকে আবার সিংহাসন দেবার ফন্দি করলে। দিল্লীতে তখন প্রথম পাঠান সুলতান বহলোললোদী। তাঁর

সঙ্গে ঘাতীরাও কুটুস্থিতা ক'রে, নিজের মেয়ের সঙ্গে সুলতানের বিয়ে দেবার ফন্দি ক'রে, খুব শক্ত হয়ে চিতোরের সিংহাসনে বসে থাকবার মতলব করছে, এমন সময় ইদর রাজ্য থেকে রায়মলকে রাজপুতসর্দারেরা খুঁজে বার করলেন। 'ঘাতীরাও' বড় বড় সর্দারদের বড় বড় জমিদারির লোভ দিয়েও নিজের দলে টানতে পারলে না! যে নিজের বাপকে খুন করতে পারে রাজপুতের মেয়েকে পাঠানের বেগম ক'রে দিতে চায়, তার দলে কোন্ রাজপুত থাকতে পারে? 'ঘাতীরাও' কাজেই গতিক খারাপ দেখে একদিন রাতারাতি সুলতানের দরবারে গিয়ে মেয়ের বিয়ের সব পাকা ক'রে চুপি চুপি আবার চিতোরে এসে বসবার মতলবে ঘোড়া ছুটিয়ে একা আসছে, এমন সময় পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে তার মৃত্যু হল। এই অবসরে রায়মল চিতোর দখল ক'রে বসলেন। সুলতান বহলোল চিতোরের রাজকুমারীকে বিয়ে করতে এসে দেখলেন বাহারো হাজার সওয়ার আগে এগারো হাজার পাইক সঙ্গে রায়-বাঘের মতো রায়মল তাঁকে ধরবার জন্যে পাহাড়ের উপর বসে আছেন। পাঠান সুলতান বিয়ে করতে এসেছিলেন বর সঙ্গে, কিংখাবের লুজি কোমরে জড়িয়ে, জরির লপেটা ফেলে চম্পট দিলেন যেখান থেকে এনেছিলেন সেই দিল্লীতে! রায়মল, তাঁর তিন ছেলে—সঙ্গ, পৃথীরাজ, জয়মল, আর একটি মাত্র ছোট ভাই সুরজমল এই চারিজনকে নিয়ে চিতোরে বসে রাজত্ব করতে থাকেন, সেই সময়ে একদিন—তখন রানা হয়েছেন বুড়ো, ছেলেরা হয়েছে বড়, দেশে রয়েছে শান্তি, আর সূখে রয়েছে রাজা-প্রজা সবাই—তখন প্রচণ্ড গরমকালে দুপুর-বেলায় বাইরে আগুন হাওয়া, বুড়ো রানাজী ভীম তালাওয়ার মাঝখানে জলের উপরে শ্বেত পাথরের তাণ্ডখানায় আরাম করেছেন; রাজকুমার তিনজন ছোট-খুড়ো সুরজমলের বাগান-বাড়িতে আড্ডা করছেন আর তাস, দাবা, গোলাপ-জলে-ভিজানো খসুথসের পাখা এমনি সব নানা কুঁড়েমি ও

আয়েসির সাজ-সরঞ্জামের মাঝে বসে এ-গল্প সে-গল্প চলেছে, কিন্তু বাইরে  
 বইছে গরম বাতাস—এমন গরম যে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ফেটে তো গেছেই,  
 ঘরের মধ্যকার দেওয়ালগুলো থেকেও তাপ উঠছে। কাজেই ঘরের  
 মধ্যে রাজকুমারেরা ঠাণ্ডা হতে চাইলেও বেশি ঠাণ্ডা রইলেন না ;  
 এ-কথায় সে-কথায় কজনের মধ্যে কে কেমন বীর, কোন লড়াই কে ফতে  
 ক'রে কোন-কোন পরগনা দখল করেছেন, প্রজারা কার নামে কি বলে,  
 এমনি নানা খুটিনাটি খিটিমিটি থেকে রাজসিংহাসন উচিত মতো কে  
 পেলে প্রজারাও সুখী হয়, দেশও ভালো হয়—এই তর্ক উঠল। রানার  
 মেজছেলে পৃথ্বীরাজ যেমন সুপুরুষ তেমনি সাহসী ; বড়ছেলে সঙ্গ  
 দেখতে মোটেই রাজপুত্রের মতো নন—সাদাসিদে ছোটখাটো মানুষটি,  
 ধীর-গম্ভীর বড়-বড় টানা চোখ ; ছোটছেলে জয়মল কাটখোঁটা, মোটা-  
 সোটা যেন চোয়াড় গোছের ; আর রানার ভাই সুরজমল খুব সুপুরুষ নন,  
 খুব কদাকারও নন—অনেকটা বুড়ো রানারই মতো নাক-চোখ। তিন  
 ভায়ে বিষম তর্ক বাধাল সিংহাসন নিয়ে। পৃথ্বীরাজ বললেন, “প্রজাদের  
 হাতে যদি রাজা বেছে নেবার ভার পড়ে তো দেখে নিও আমাকেই  
 রাজপুত্রেরা রাজা করবে।” জয়মল ব'লে উঠলেন, “ওসব বুঝিনে।  
 দেখছ এই হাতখানা ! জোর যার মূলুক তার !” সঙ্গ, তিনি সবার বড়,  
 একটুখানি হেসে বললেন, “ভবানীমাতা যাকে সিংহাসন দেবার দিয়ে  
 বসে আছেন ; বিশ্বাস না হয়, চল চারণীদেবীর মন্দিরে গুণিয়ে দেখি  
 কার অদৃষ্টে সিংহাসন লেখা রয়েছে।” সুরজমল তিনজনকে ধমকে  
 বললেন, “আঃ, এ সব কি কথা হচ্ছে ? দাদা শুনলে রক্ষে থাকবে না।  
 হয়তো তোমাদের সঙ্গে আমাকেও দেশছাড়া করবেন। সিংহাসন নিয়ে  
 নাড়াচাড়া কেন বাপু ! একি সতরঞ্চ না দাবা খেলা পেলে, যে এখন  
 রাজা উজির মারছ ? নাও একটু গোলাপ-জল মাথায় দাও, ঠাণ্ডা  
 হও ; থাক ওসব কথা।” কিন্তু বাইরের গরম তখন রাজকুমারদের

মগজে চড়েছে, ঠাণ্ডা হবে কে ! সবাই উঠে বললেন, “চল খুড়ো, থাক এখন ঠাণ্ডা হওয়া ; চারণীর কাছে গিয়ে আজ ঠিক করব সিংহাসনটি কার পাওনা ।” বুদ্ধিমান সুরজমল দেখেন বিপদ—গেলে রাগেন দাদা, না গেলে রাগেন দাদার তিন পুত্র, তার মধ্যে একজন গুণ্ডা আর— একজন বেজায় সাহসী ; কাজেই সুরজমল চললেন বলতে-বলতে, “শেষে দেখছি রাজত্বটা আমারই হবে, তোমরা তিন ভাই হয় দেশছাড়া হবে কালই দাদার ছুঁমে, নয়তো দুদিন পরে নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি ক’রে মরবে ; বাকি থাকব আমি রাজ্যের ভোগ ভুগতে ।” পৃথ্বীরাজ বলে উঠলেন, “সেইজন্তে তোমাকেও সঙ্গে নিচ্ছি, তোমারও কপালে কি আছে সেটাও দেখা চাই তো ?” সুরজমল নিজের আর তিন ভায়ের কপালে এক-একবার টোকা মেরে বললেন, “গুণে দেখার প্রয়োজন নেই, আওয়াজেই বুঝি সব ফোঁপরা !”

উদয়পুর থেকে পাঁচ ক্রোশ হবে নাহরায়ুংরা । সেইখানে এক পাহাড় ; তাকে বলে ব্যাম্বমেরু ; তারই উপরে থাকেন চারণীমন্দিরের সিদ্ধিকরী ষোগিনী । পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে দেবীর দেউল । রাজপুত্রেরা ছুরস্ত গরমে ঘোড়া ছুটিয়ে যখন মন্দিরে উপস্থিত হলেন তখন সন্ধ্যাপূজার ষোগাড় করতে সিদ্ধিকরী বাইরে গেছেন ; মন্দির খালি ; তারই মধ্যে অন্ধকারে কালো পাথরের চারণীদেবীর ফটিকের তিনটে চোখ মাত্র দেখা যাচ্ছে আর গুহার সামনে মস্ত একটা পাথরের চাতালে সন্ধ্যাবেলার আলো পড়েছে—রক্ত যেন ঢেলে দিয়েছে ! সিদ্ধিকরীকে মন্দিরে না দেখে সুরজমল বলে উঠলেন, “কেমন, বলেছিলেম তো কপাল ফোঁপরা ! মন্দির খালি, এখন দেবীকে একটি ক’রে প্রণাম দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে চল ।” পৃথ্বীরাজ ঘাড় নেড়ে বললেন, “তা হবে না, এইখানে বসতে হবে, আরতির পরে হাত-গুণিয়ে তবে ছুটি !” একদিকে একটা বাঘের ছাল পাতা ছিল আর একদিকে সিদ্ধিকরীর খাটিয়া, তার উপরে ছেঁড়া

কাথা। পৃথীরাজ তাড়াতাড়ি গিয়ে খাটিয়াতে বসলেন, দেখাদেখি জয়মলও উঁচুতে খাটিয়ায় বসল। বাশের খাটিয়া একবার মচাৎ ক'রে শব্দ ক'রেই চুপ করলে। সঙ্গ গিয়ে বসলেন বাঘছালের উপরে মাটিতে, আর সুরজমল বসলেন একটা হাঁটু বাঘছালে রেখে একেবারে আশুনের মতো তপ্ত পাথরের যেকোন।

ভয়-সঙ্কায় গুহার মধ্যে অন্ধকার বেশ একটু ঘনিষে এসেছে, সেই সময় প্রদীপ-হাতে সিদ্ধিকরী গুহাতে ঢুকেই দেখেন চার মূর্তি! সঙ্গ উঠে সিদ্ধিকরীকে নমস্কার ক'রে বসলেন। সুরজমলকে আর উঠতে হলনা— তিনি যে মাটিতে বসেছিলেন সেই মাটিতেই সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন। পৃথীরাজ খাটিয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘাড়টা নোয়ালেন, হাতছটো একটু কপালের দিকে উঠেই আবার নেমে গেল; আর জয়মলটা উঠলও না, নমস্কারও দিলেনা, বসে-বসেই বললে, “মাতাজী” গণনা ক'রে বলুন তো, আমাদের মধ্যে কার কপালে চিতোরের সিংহাসনটা রয়েছে?” সিদ্ধিকরী কোন উত্তর না দিয়ে কেবল নিজের কপালেই হাত বোলাতে লাগলেন আর গেকরাকাপড়ের খুঁটে মুখ মুছতে থাকলেন, দেখে পৃথীরাজ বলে উঠলেন—“ভাবেন কি? বড় জরুরী কথা। বেশ ক'রে ভেবে-চিন্তে গণনা ক'রে উত্তর দেবেন।” সঙ্গ বললেন, “আগে চারণীর পূজোটা শুঁকে সেরে নিতে দাও, পরে ওসব করো।” “সেই ভালো।” বলে সিদ্ধিকরী পূজোয় বসলেন; চারণীর সামনে একবার পিদিম নেড়ে ঘণ্টাটা বাজিয়ে গোটাকতক প্রসাদী গাঁদাফুল চারপুত্রের মাথার পাগড়িতে গুঁজে দিয়ে বললেন, “রাজকুমারেরা একটা ইতিহাস বলি শোন—পূর্বকালে উজ্জয়িনীনগরে একদিন মহারাজা বিক্রমাদিত্য রাজ-সভা ছেড়ে অন্দরে গিয়ে জলযোগ করতে বসবেন এমন সময় লক্ষ্মী-সরস্বতী বিবাদ করতে করতে সেখানে উপস্থিত! মহারাজা তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে

বললেন, দেবী, আপনাদের কি প্রয়োজনে আগমন, দাসকে বলুন !  
 দুজনেই রাজাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, কংস বিক্রমাদিত্য, তুমি তৌ  
 রাজা, বিচার কর দেখি আমাদের দুজনের মধ্যে কে বড় ! বীণা-হস্তে  
 সরস্বতী ঝংকার দিয়ে বললেন, আমি বড়, না ও-বড় ? লক্ষ্মী বীণাপাণির  
 ঝংকারের উপর অলংকার দিয়ে বললেন, এই আমি, না ওই ওটা,  
 কে বড় ? রাজা দেখেন বড় গোলযোগ—একে বড় করলে উনি চটেন,  
 ওকে খাটো করলে তিনি চটেন ! রাজা দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথা চুল-  
 কোচ্ছেন দেখে বিক্রমাদিত্যের ছোট রাণী খ'লে উঠলেন—ঠাকরুণরা,  
 রাজাকে কিছু খেয়ে নিতে দিন, গীরাদিন বিচার ক'রে ওর এখন মাথার  
 ঠিক নেই, সুবিচার করেন কেমন ক'রে ? আজকের রাতটা ওকে ভেবে  
 ঠিক করতে দিন, কাল রাজসভায় ঠিক বিচার হয়ে যাবে দেখবেন !  
 রাজা বললেন, এ পরামর্শ মন্দ নয়, কঠিন সমস্যা, একটু সময় পেলে  
 ভালো হয় । দেবীরা তথাস্তু ব'লে বিদায় হলেন । রাজা জলযোগে বসে  
 ছোটরাণীকে বললেন দেবীদের আজকের মতো তো বিদায় করলে কিন্তু  
 কালকের বিচারটা কি হবে কিছু ঠাউরেছ কি ? রাণী ভয়কুটি ক'রে  
 বললেন, বিচারের আমি কি জানি ! তোমার সভায় নবরত্নের মধ্যে  
 কেউ পণ্ডিত, কেউ কবি, কেউ মন্ত্রী, কেউ যন্ত্রী, তাদের শুধোওনা । রাজা  
 মাথা চুলকে সভায় প্রস্থান করলেন । সভার মধ্যে নবরত্ন হাজির—  
 ধর্মস্তুরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেজালভট্ট ঘটকর্পূর, কালিদাস,  
 বরাহমিহির, বরকচি রাজার প্রেরণে শুনে ন'জনেই মাথা চুলকতে  
 আরম্ভ করলেন ; রাত্রি দুইপ্রহর বাজল কিছুই মীমাংসা হলনা, দুই  
 দেবীর বিচার কি হিসেবে করা যায় ? সরস্বতীকে বড় বললে চটেন  
 লক্ষ্মী, রাজ্যপাট সব যায়, নবরত্নেরও বাসস্থান বন্ধ হয় ! আবার যদি  
 বলা যায় সরস্বতী ছোট, লক্ষ্মীই বড়, তবে বিদ্যে পালায়, বুদ্ধি পালায়,  
 কালিদাসের কবিতা লেখা বন্ধ, ধর্মস্তুরির চরকসংহিতা, বরাহমিহিরের

পাঁজি-পুঁজি খনার বচন সবুই মাটি ! রাজাই বা কি বুদ্ধি নিয়ে রাজ্য  
 চালান, হিসেব দেখেন, বিচার করেন ? বিক্রমাদিত্য বিষম ভাবিত হয়ে  
 অন্তরে এসে বিছানা নিলেন \* রাণী দেখেন রাজার নিদ্রা নেই, কেবলি  
 এপাশ-ওপাশ করছেন ; যেন শয্যাকণ্টকী হয়েছে । তারপর—এমন সময়  
 পৃথ্বীরাজ ব'লে উঠলেন—“ও-গল্পতো আমরা জানি । হুই দেবীর একজন  
 এসে বসেছিলেন স্বর্ণ-সিংহাসনে, অণ্ডে বসেছিলেন রূপোর খাটে ; ছোট-  
 বড় বিচার আপনিই হয়েছিল । গল্প থাক, এখন দেখুন দেখি বিচার  
 ক'রে আমাদের মধ্যে রাজ্য হবে কে ?”

সিদ্ধিকরী একবার চারজনের দিকে চেয়ে বললেন, “রাজকুমার, তোমরা  
 নিজেই নিজেদের বিচার শেষ ক'রে বসে আছ । সঙ্গ—যিনি বসে  
 আছেন বাঘছালে বীরসনে, উনিই ঠিক রাজার উপযুক্ত জায়গায়  
 রয়েছেন—রাজেশ্বর ! সুরজমল বসেছেন মাটিতে—সঙ্গের কাছেই  
 মাটিতে, কাজেই দেখা যাচ্ছে জমিতে গুর দখল, সিংহাসনের কাছাকাছি  
 উনি থাকবেন—হয় মন্ত্রী, নয় সর্দার, নয় জমিদার ! আর পৃথ্বীরাজ,  
 জয়মল, তোমরা বসেছ—সন্ন্যাসিনী যে অগ্নি, আমার আসনে ছেঁড়া  
 কাঁথায়, কাজেই ছেঁড়া কাঁথায় গুরে রাজ্যের স্বপ্ন দেখা ছাড়া তোমাদের  
 অদৃষ্ট আর কিছুই নেই !” এই কথা ব'লেই সিদ্ধিকরী গুহার অন্ধকারের  
 মধ্যে চলে গেলেন ; চার রাজকুমারের চোখ বাঘের মতো কটমট ক'রে  
 এর ওর দিকে চাইতে থাকল ! সর্ব-প্রথম সুরজমল কথা বললেন,  
 “তাহলে ?” “তাহলে সিংহাসন কার এইখানেই স্থির হয়ে থাক আজই !”  
 ব'লেই পৃথ্বীরাজ তলোয়ার খুলে সঙ্গকে আক্রমণ করলেন । সঙ্গ ছুটে  
 গুহার বাহিরে যাবেন, তলোয়ারের চোপ পড়ল তাঁর একটি চোখের  
 উপরে । চারণীদেবীর সামনে তাঁয়ের হাতে তাঁয়ের রক্তপাত ঘটল ! সঙ্গ  
 প্রাণভয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন । একদিকে  
 গেলেন সুরজমল ; পৃথ্বীরাজ, জয়মল গেলেন আর একদিকে—এর

পিছনে উনি, তাঁর পিছনে তিনি ; অন্ধকার ঢেকে গিলে চারজনকেই ।  
 চারণীমন্দির থেকে প্রায় একরাতে পথে রাঠোরসর্দার 'বিদা'র কেয়ার  
 বুকজের ধরনে কাঁচামাটির দেওয়ালঘেরা খামার বাড়ি । জোর হয়ে  
 আসছে কিন্তু মেঘে-ঢাকা আকাশে তখনো আলোর টান একটিও  
 পড়েনি । উঠানের মাঝে মস্ত তেঁতুলগাছটার আগায় পোষা ময়ূরটা  
 ডানায় মুখ গুঁজে চুপ ক'রে আছে । গাছের ডলায় হালের গরুদুটো  
 মাটিতে পড়ে আরামে বিমচ্ছে । কোথাও কোনো শব্দ নেই ; কেবল  
 সর্দারের ঘোড়া নিয়ে দরজার কাছে একটা ছোকরা-রাজপুত দাঁড়িয়ে  
 আছে ; সেই ঘোড়া একে-একবার ঘাড় নাড়ছে আর তারই মুখের লাগানে  
 পরান লোহার আঁটা আর কড়াগুলো একে-একবার আওয়াজ দিচ্ছে—  
 টিংটিং বিন্ বিন্ । বিদা দূরগ্রামে পূজো দিতে যাবেন, তাই ভোর না  
 হতেই প্রস্তুত হয়ে ঘর থেকে বার হবেন, এমন সময় দূরে অন্ধকারের  
 মধ্যে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল !—কে যেন তেজে ঘোড়া ছুটিয়ে  
 আসছে । দেখতে-দেখতে রক্তমাখা রাজকুমার সঙ্গ "রক্ষা কর" বলে  
 বিদার দরজায় এসে ধাক্কা দিলেন । তাঁর একটা চোখের উপরে তলো-  
 যারের চোট পড়েছে, শরীরও অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত । বিদা তাড়াতাড়ি দরজা  
 খুলে রাজপুত্রকে দেখেই বলে উঠলেন, "একি ! এমন দশা আপনার কে  
 করলে ?" সঙ্গ দু-কথায় তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন—প্রাণ সংশয়, পৃথ্বীরাজ আর  
 সুরজমল দুইজনেই অজ্ঞান হয়ে রাস্তার মাঝে পড়েছেন কিন্তু জয়মল  
 এখনও পিছনে তাড়া ক'রে আসছেন তাঁকে মারতে । বিদা সঙ্গকে তাঁর  
 নিজের ঘোড়া দিয়ে বললেন, "রাজকুমার, ভিতরে গিয়ে বিশ্রাম করুন,  
 পরে নতুন ঘোড়ায় অল্প গ্রামে রওনা হবেন ।" ওদিকে জয়মল আসছেন,  
 একটা ঝড়ের মতো—মাঠের উপর দিয়ে । সঙ্গের ইচ্ছে তখনি তিনি  
 পলায়ন করেন, কিন্তু রাজভক্ত বিদা কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় না  
 কিছু না ধাইয়ে-দাইয়ে । ওদিকে বিপদ ক্রমে এগিয়ে আসছে ! সঙ্গ



ইতস্ততঃ কুরছেন দেখে বিদা বললে, “কোনো ভয় নেই, আপনি ভিতরে যান। নিশ্চিত হয়ে একটু বিশ্রাম করে যতক্ষণ না আপনি খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ততক্ষণ জয়মলকে এই দরজার চৌকাঠ পার হতে হবে না, আমি তাকে ঠেকিয়ে রাখব।” তাই হল। সন্দের নতুন ঘোড়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বমুখে অনেক দূরে ছোট একটি কালো ফোঁটার মতো আন্তে আন্তে দূর মাঠের একেবারে শেষে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেছে, সেই সময় তিনঘণ্টা ধস্তাধস্তির পরে বিদাকে মেরে তবে জয়মল বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে দেখলেন সঙ্গ চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর অকর্মণ্য ক্ষতবিক্ষত ঘোড়াটা উঠানের মাঝে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে খানিক শুকনো খাস চিবুচ্ছে আরামে। জয়মল রাজভক্ত রাজপুত্রবীরের রক্তে রাঙা হাতখানি দিয়ে নিজের কপাল চাপড়ে হতাশ মনে প্রাণশূন্য বিদার দিকে খানিক চেয়ে রইলেন—তারপর ঘাড় নিচু করে আন্তে আন্তে বেরিয়ে গেলেন।

এদিকে সকাল হয়ে গেল, কোন অজানা গাঁয়ের কিবাণরা সকালে ক্ষেতে যেতে-যেতে পথের ধারে দেখলে রক্তমাখা ছুই রাজকুমার সুরজমল আর পৃথীরাজ! সবাই মিলে ধরাধরি করে রাজপুত্রদের ডুলিতে তুলে গাঁয়ে নিয়ে রাখলে। এদিকে মহারানারও লোকজন—তারাও বেরিয়েছে সন্ধানে ঘোড়া পালকি সব নিয়ে, রাজকুমারদের ফেরাতে; কিন্তু কেবল পৃথীরাজ সুরজমল দু-জনকে তারা সন্ধান করে ফিরে পেলে, আর দু-জন যে কোথায় তার আর খবরই হল না! পৃথীরাজ রাণীদের যত্নে আন্তে-আন্তে মেরে উঠলেন, সুরজমলের চোট বেশী, অনেক তদ্বিরে তিনি সুস্থ হলেন। মহারানা চার কুমারের ব্যাপার শুনে একদিন পৃথীরাজকে ডেকে বললেন, “এই যে ঘটনা ঘটেছে, এর জন্তে তুমিই দায়ী। সঙ্গ একেবারে নির্দোষ। সে কোথায় আছে, কি নেই, কিছুই জানা যাচ্ছে না; বেঁচে থাকতো তোমারই ভয়ে সে কোথায় লুকিয়ে

আছে। মনে করনা তোমাকে আমি চিত্তোরে বেশ আরামে বসিয়ে  
 রাখব, আর আমি চোখ বুজলেই আশ্বে-আশ্বে সিংহাসনে তুমি উঠে  
 বসবে! আজই তুমি ঘোড়া অস্ত্র যা তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে বিদায় হও।  
 লড়াই যদি চাও তো বড়-ভায়ের সঙ্গে না লড়ে পারতো রাজ্যের  
 শত্রুদের জয় করবে, তবে বুঝব তুমি বীর—যাও।” ছেলের উপর এই  
 হুকুম দিয়ে সুরজমলকে রানা ডেকে বললেন, “তুমি সঙ্গকে বাঁচাতে  
 চেয়েছিলে সেই জন্তে তোমাকে বেশী শাস্তি দেব না, আজ থেকে তুমি  
 আমার আত্মীয় সারংদেবের ওখানে গিয়ে থাক, চিত্তোর-মুখো  
 হয়ো না।” সুরজমল তো নির্বাসনে যান! এখন পৃথ্বীরাজ বার হলেন  
 চিত্তোর ছেড়ে দিকবিজয়ে। তিনি জানতেন মহারানার কাছে যদি  
 কখনো ক্ষমা পান তো সে বীরত্ব দেখিয়ে, মেবারের শত্রুদের শাসন  
 ক’রে তবে। রানা রাগলেও, প্রজারা পৃথ্বীরাজকে সত্যি ভালোই বাসত,  
 কাজেই তাঁকে একেবারে একলা পড়তে হল না। দু-একজন ক’রে  
 ক্রমে একটি ছোটোখাটো দল তাঁর সঙ্গে জুটল, যাদের কাজই হল  
 এখানে-ওখানে লড়াই ক’রে বেড়ান। এমনি এদেশে সেদেশে দল  
 নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পৃথ্বীরাজের যা-কিছু টাকাকড়ি সম্বল ছিল  
 গেল কুরিয়ে। শেষে এমন দিন এল যে দিনের খোরাক, তাও জোটান  
 ভার! এখন একটা ছোট-খটো রাজ্য জয় ক’রে না বসতে পারলে  
 আর উপায় নেই। এই অবস্থায় পৃথ্বীরাজ একদিন নিজের হাতের একটা  
 মানিকের আংটি গদাওয়ারের উঝা নামে এক জহরীর কাছে বাঁধা দিয়ে  
 কিছু টাকা আনতে পাঠালেন। এই উঝাই একদিন ঐ আংটিটা  
 পৃথ্বীরাজকে অনেক টাকায় বেচেছিল; আংটি দেখেই জহরী তাড়াতাড়ি  
 টাকাকড়ি নিয়ে যেখানে পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সামান্য লোকের মতো একটা  
 সরাইখানায় দিন কাটাচ্ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললে, “এ কি  
 দেখছি রাজকুমার! টাকার দরকার ছিল তো একটু লিখে পাঠালেই

হত আংটিটা বাধা দিয়ে বাজারে কেন বদনাম কিনছেন ?” পৃথ্বীরাজ উঝাকে চুপিচুপি বুঝিয়ে বললেন, “ওই আংটি ছাড়া আমার এমন কোনো সম্বল নেই যে তোমার টাকা শোধ দেব, তাছাড়া আংটি তো একদিন না একদিন পেটের দায়ে বেচতেই হবে ! আমার কতগুলি সঙ্গী দেখছ তো ! এদের শুকনো মুখে আধপেটা তো রাখতে পারিনে ! পৃথ্বীরাজের ছুঃখের কাহিনী শুনে উঝার চোখে জল এল । সে দুইহাত জোড় ক’রে বললে, “কুমার, এই নিন টাকা ! আমি আংটি চাইনে । আমি আপনার প্রজা, মহারানার হুন চিরকাল খাচ্ছি ।” পৃথ্বীরাজ উঝাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বললেন, “ভাই, আজ যেন তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে কিন্তু এর পরে কি হবে ?” উঝা পৃথ্বীরাজকে চুপিচুপি বললে, “দেখুন মীনা-সর্দারের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এই দেশটা আপনি দখল ক’রে বসুন । রাজ্যের একটা শত্রুও নাশ হবে, আপনারও মান বাড়বে ।”

পৃথ্বীরাজ ছদ্মবেশে সেই দিনই গিয়ে মীনা সর্দারের কাজে দলবল নিয়ে ভর্তি হলেন । রাজস্থানের মীনারা—জংলি, দুর্দান্ত জাত ; লুটপাট করাই তাদের কাজ । এদেরই রাজা মীনারায় নাম নিয়ে সমস্ত গদাওয়ার শাসন করছেন । মহারানাকেও সে তুচ্ছ করে ; নদালা ব’লে একটা গ্রামে তার আড্ডা । পৃথ্বীরাজ তাঁর পাঁচটি সঙ্গী - যশ, সিদ্ধিয়া, সঙ্গমদেবী, অভয় আর জঙ্কুকে নিয়ে এই দুর্দান্ত মীনাকে জব্দ করার মতলব করলেন । আহেরিয়া-পরব রাজস্থানের একটা মস্ত আনন্দের দিন ; সেইদিন চাকর-মনিব সব এক হয়ে শিকার, বনভোজন—এমনি নানা আমোদে দিনরাত মত্ত থাকে । সেই আনন্দের দিনে মীনারায় বড়-বড় মীনাকে নিয়ে বনের মধ্যে যখন তাড়ি খেয়ে আনন্দ করছে, সেই সময় নিজের দলবল সমেত পৃথ্বীরাজ তাকে আক্রমণ ক’রে তাদের ঘর ছুয়ার জালিয়ে ছারখার ক’রে দিলেন । রাজা কাটা পড়ল । মীনারা যারা বাকী রইল, বনে-জঙ্গলে

পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলে। উঝাকে পৃথীরাজ গদ্যায়ারের শাসনকর্তা  
ক'রে নিজের ধার শুধে আবার দিক্‌বিজয়ে বার হলেন—নীতিমত  
কৌজ আর রসদ সঙ্গে।

এদিকে জয়মল, তিনি ঘুরতে-ঘুরতে, বেদনোরে গিয়ে হাজির। সে সময়ে  
বেদনোরে টোডার রাজা রায় শূরতান সিং পাঠানদের উৎপাতে রাজ্য-  
সম্পদ সব হারিয়ে নিজের একমাত্র কন্যা পরমা সুলন্দরী তারাবাইকে নিয়ে  
মহারানার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। তারাবাই যেমন সুলন্দরী, তেমনি  
বুদ্ধিমতী, গুণবতী, তেজস্বিনী। কত রাজপুত্র তাঁকে বিয়ে করতে চায়  
কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞা পাঠানদের হাত থেকে যে বাপের সিংহাসন উদ্ধার  
করবে, তাকেই বিয়ে করবেন। জয়মল বেদনোরে এসে এই খবর  
সুনলেন; একদিন তারাবাইকেও দেখলেন—ঘোড়ায় চড়ে ধনুর্বাণ হাতে  
শিকারে চলেছেন—যেন দেবী দুর্গা! জয়মল টোডা-রাজ্য উদ্ধার ক'রে  
দেবেন ব'লে প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখে শূরতানের কাছে ঘটক পাঠালেন।  
শূরতান সিং জয়মলকে খুব খাতির ক'রে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন।  
কিন্তু দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস, জয়মল পাঠানদের সঙ্গে  
লড়তে যাবার নামও করেন না; উল্টে বরং হঠাৎ রাতারাতি শূরতানকে  
মেয়ে তারাবাইকে বন্দী করে নিয়ে পালাবার মতলবে রইলেন। শেষে  
অন্ধকার রাতে একদিন জয়মল হাতিয়ার হাতে চুপি-চুপি শূরতানের  
অন্দর-মহলের দিকে অগ্রসর হলেন—ভূতের মতো মুখে কালিঝুলি  
মেখে। বেশীদূর যেতে হল না, অন্দরের দরজাতেই ধরা পড়ে গেলেন।  
কিন্তু জয়মল দুর্দান্ত গুণ্ডা; তাঁকে ধরে রাখা প্রহরীদের সাধ্য হল না।  
তিনি তলোয়ার খুলে তারাবাইকে তাঁর শয়ন-ঘর থেকে একেবারে হাত  
ধরে টেনে বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। তারাবাই সামান্য মেয়ে তো  
ছিলেন না! এক ঝাপটায় জয়মলকে দশহাত দূরে ফেলে দিয়ে একেবারে  
বাধিনীর মতো তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটি ছুরির ঘায়ে তার সব

আম্পর্ষা শেষ ক'রে দিলেন। শূরতান সিং ছুটে এসে জয়মলের মাথাটা সঙ্গে-সঙ্গে কাঁধ থেকে ভূঁরে নামিয়ে মিথ্যাবাদীর শাস্তি দিলেন রীতিমত। জয়মল মহারানার ছেলে; আর শূরতান রাজা হলেও এখন মহারানার আশ্রিত; কাজেই চিত্তোরে যখন এই খবর পৌঁছল, তখন সবাই জামলে এইবার শূরতান গেলেন। কিন্তু মহারানা সমস্ত ব্যাপার শুনে দূতদের বললেন, “জয়মল শুধু যে আশ্রিত রাজার অপমান করেছে তা নয়, সে মিথ্যাবাদী, সে চোর, নির্বোধ, গোঁয়ার। কোন বাপ তার নিজের কণ্ঠার অপমান সহিতে পারে? শূরতান তার উপযুক্ত শাস্তিই দিয়েছেন। এমন অপদার্থ ছেলে গেছে, ভালোই হয়েছে। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যাও, শূরতানকে বল গিয়ে—আজ থেকে বেদনোর রাজ্য তাঁকে দিলেম।”

পৃথ্বীরাজ যখন শুনলেন ছোটভায়ের কাণ্ড, তখন রাগে লজ্জায় তাঁর মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। তিনি সেইদিনই বেদনোরের দিকে রওনা হলেন। রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ, রাজকুমারী তারাবাই—দুজনেই সমান সুন্দর। সমানে সমানে মিলিল। ইনি দেখলেন ঠুকে, উনি দেখলেন ঐকে। ভালোবাসলেন দুজনেই দুজনকে; কিন্তু প্রতিজ্ঞা রয়েছে, সেটা না পূর্ণ করতে পারলে বিয়ে হবার উপায় নেই! পৃথ্বীরাজ নিজের তলোয়ার ছুঁয়ে শপথ করলেন টোডারাজ্য তিনি উদ্ধার করবেনই; আর সেইদিনই তারাবাইকে সঙ্গে নিয়ে আজমীরের দিকে ছদ্মবেশে রওনা হলেন। সঙ্গে গেল পৃথ্বীরাজের সেই পাঁচ সঙ্গী আর অনেক পিছনে চললেন শূরতান অসংখ্য রাজপুত্র সৈন্য নিয়ে। তখন আশ্বিন মাস, মহরমের দিন। টোডাশহরের মোগল-বাজারের প্রকাণ্ড চক—নিশেন আর ঘোড়া আর নানাবর্ণের কাগজে তাজিয়া, ছলছল, পাঞ্জা, লাঠি-সড়কি, ঢাল-তলোয়ার আর লোকে-লোকে গিসগিস করছে। স্বয়ং সুলতান জুম্মা মসজিদের ছাদে উঠে তামাসা দেখছেন, এমন সময় মস্ত একটা তাজিয়া

সঙ্গে হাসান-হোসেন করতে-করতে একদল লোক ঠিক সুলতান যেখানে  
 রয়েছেন সেখানে গিয়ে থামল। সুলতান ঝরকা থেকে মুখ ঝুকিয়ে  
 দেখলেন ছজন ফকির সেই তাজিয়ার সঙ্গে। আর বেশী কিছু সুলতানকে  
 দেখতে হল না; ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা তীর এসে সুলতানের  
 বুকের মাঝ থেকে প্রাণটি শুধে নিয়ে সোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল—  
 আকাশের দিকে। টোডার সুলতান উলটে পড়লেন; সঙ্গে-সঙ্গে রাজপুত  
 ফৌজ এসে শহরে হানা দিলে। রাজপুত যারা, তারা গিয়ে পৃথ্বীরাজ আর  
 তারাবাইকে ঘিরে লড়তে লাগল—মুসলমানদের সঙ্গে। সেই অবসরে  
 সুলতানের যত আমীর-ওমরা লুণ্ঠি ছেড়ে, দাড়ি ফেলে, বিবি আর  
 মুরগির খাঁচা লুকিয়ে নিয়ে, রাতারাতি শহর ছেড়ে আজমীরের দিকে  
 চম্পট দিল। সকাল বেলা পৃথ্বীরাজ টোডা দখল ক'রে নিলেন।

পৃথ্বীরাজ আর তারাবাইয়ের বীরত্বের কথা মহারানার কাছে পৌঁছল।  
 এইবার বাপের প্রাণ গলল। জয়মল নেই; সঙ্গ কোথায় তা কেউ জানেনা,  
 একমাত্র রয়েছেন পৃথ্বীরাজ—ছেলের মতো ছেলে; মহারানা পৃথ্বীরাজের  
 সঙ্গে তারাবাইয়ের বিয়ে দিয়ে কমলমীরের কেল্লায় ছজনকে থাকবার  
 হুকুম দিলেন। মেবারের একেবারে শেষ সীমায় কমলমীর। এ সেই কেল্লা,  
 যেখানে লছমীরানী এতটুকু হাঙ্গিরকে নিয়ে বাস করতেন। কতদিন  
 কেটে গেছে, কেল্লা শূন্য পড়েছিল; আর আজ আবার কত পুরুষ পরে  
 পৃথ্বীরাজ-তারাবাই—বর আর বৌ—হাসি বাঁশি গান দিয়ে সেই পুরানো  
 কেল্লার শূন্য ঘরগুলি পূর্ণ ক'রে দেখা দিলেন। এই বাপেতে-ছেলেতে  
 বরেতে-বধুতে মিলন আর আনন্দের দিনে একসময় চিতোরের পৃথ্বীরাজ  
 মহারানার সভায় বসে আছেন, সভা প্রায় ভঙ্গ হয়, মহারানা উঠি-উঠি  
 করছেন—এমন সময় মালোয়া থেকে দূত এসে খবর পাঠালে এখনি  
 মহারানার সঙ্গে দেখা করতে চাই। একসময় ছিল, যখন চিতোরের  
 মহারানার সঙ্গে দেখা করতে হলে দিল্লীর বাদশার দূতকেও অন্তত

পনেরো দিন মহারানার সুবিধার জন্য অপেক্ষা করতে হত, কিন্তু আজ মালোয়ার দূত এসেই বুক-ফুলিয়ে, কোন ছকুমের অপেক্ষা না রেখে মহারানার দরবারে ঢুকল। শুধু তাই নয়, লোকটা একেবারে মহারানার গা-খঁেলে বসে যেন সমানে-সমানে কথাবার্তা শুরু ক'রে দিলে। দূতের এই আশ্পর্ধা দেখে পৃথ্বীরাজ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। খুব খানিক বাজে বকে দূত বিদায় হবার পর, পৃথ্বীরাজ ঐ মালোয়ার দূতকে এত ভর আর খাতির করবার কারণটা মহারানাকে শুধোলেন। বুড়ো রানা পৃথ্বীরাজের পিঠে হাত বুলিয়ে জবাব দিলেন, “বুঝলে না, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই দস্তহীন সিংহের মতো, গাধাও আমাকে লাথী মারতে চাচ্ছে। তোমরা নিজেদের মধ্যেই ভায়ে-ভায়ে লড়তে ব্যস্ত রয়েছ, তাই আমাকে সবদিক ঠাণ্ডা রেখে, খুসি রেখে কোনো রকমে শান্তিতে নিজের আর প্রজাদের জমিজমা জরু-গরু সামলে চলতে হচ্ছে—আজ কবছর ধরে।” পৃথ্বীরাজ বাপের কথায় কোন জবাব দিলেন না, কিন্তু বাপের কত যে দুঃখ, তা বুঝতে আজ তাঁর দেরী হল না। তিনি লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে সভা থেকে বেরিয়ে একেবারে নিজের দলবল নিয়ে সোজা মালোয়া রাজার রাজ্যে গিয়ে হাঁক দিলেন, “যুদ্ধং দেহি!”

দুই দলে লড়াই বাধল। মাঠের মাঝে দুই দলের তাঁবু পড়েছে। যুদ্ধের আগের রাতে মালোয়ারাজ নিজের শিবিরে মখমলের গদিতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে গ্যাট হয়ে বসে মহা ধুমধামে নাচ দেখছেন, এমন সময় ঝড়ের মতো পৃথ্বীরাজ এসে রাজাকে একেবারে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে নিজের কোটে এনে বন্ধ করলেন। মজলিস ভেঙে গেল—ঝাড়লঠনগুলোর সঙ্গে চুরমার হয়ে! নাচনী, গাইয়ে সবাই হাঁ-ক'রে চেয়ে রইল—পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত সাহস দেখে! রাজার সেনাপতি তাড়াতাড়ি সৈন্য সাজাচ্ছেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ মালোয়ারাজেরই লিখন সেনাপতির কাছে দিয়ে

পাঠালেন, “আমি চিতোর চল্লেখ—বন্দী হয়ে । কিন্তু খবরদার আমাকে ছাড়াবার চেষ্টাও কর না । তা হলেই আমার প্রাণ যাবে, এখন এসে ভূমি আমার সঙ্গে দেখা কর, যুদ্ধ বন্ধ ক’রে দাও ।” রাজা-রাজড়ার কথা—সেনাপতি সমস্ত সৈন্য ফিরিয়ে দিয়ে শুকনো-মুখে একা পৃথীরাজের শিবিরে হাজির হলেন । পৃথীরাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, “রাজার প্রাণের জন্তে কোনো ভয় নেই ; আমি ঠেকে চিতোরে নিয়ে যাচ্ছি—খুব যত্নেই রাখব আর পুস্থ শরীরেই ফিরিয়ে দেব ; তোমাদের রাজার সেই হামবড়া দূতটাকেও ফিরে পাবে । মহারানা দূতকেও চাননা, বন্দীকেও নয়, কেবল মালোয়ার কাছ থেকে যে-নমস্কারটা তাঁর প্রাপ্য, তাই তিনি আমাকে আনতে হুকুম দিয়েছেন । তাই তোমাদের রাজার একবার স্বশরীরে চিতোরে যাওয়া দরকার । কিন্তু এখান থেকে কিংবা পথের থেকে যদি রাজাকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা কর, তবে গুর ধড়টিই শুধু ফিরে পাবে. মাথাটি গিয়ে পড়ে থাকবে চিতোরের মহারানার সিংহাসনের নিচেই—পা রাখবার পিঁড়িখানির ঠিক সামনেই !”

মহারানা সভায় বসে আছেন, পৃথীরাজ মালোয়াকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত । সবাই দেখে অবাক হয়ে গেল । সেই সময় একজন পৃথীরাজের চর দূতের ঘাড় ধরে এনে বললে, “শিখে নাও মহারানার সঙ্গে কেমন ক’রে কথা বলতে হয়—তোমার নিজের দেশের রাজার কাছে ।” দূত ধরহরি কাঁপতে লাগল ; তার কপাল বেয়ে কালঘাম ছুটল । মহারানা ব্যাপার বুঝে খুব খাতির ক’রে মালোয়াকে নিজের কাছে বসালেন, তারপর কিছুদিন চিতোরে আরামে থাকার পর মালোয়ার রাজা আর রাজদূত দুজনেই ছুটি পেয়ে দেশে গেলেন ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে রানার আত্মীয় সারংদেব আর পুরজমল দুজনে মিলে হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন । পৃথীরাজ তখন অনেক দূরে—কমলমীরে ; সওয়ার খবর নিয়ে সেদিকে ছুটল—মহারানা দলবল



নিয়ে চটপট লড়াইয়ে বেরিয়ে গেলেন। সন্নী, বাটেয়া, নারি আর  
 নিমচ এর মধ্যে যত পরগণা সমস্ত দখল ক'রে চিতোরের খুব কাছে  
 গাভিরী-নদীর ওপারে সুরজমল এসে দেখা দিলেন প্রকাণ্ড ফৌজ নিয়ে  
 সেইখানে ভীষণ যুদ্ধ বাধল। রানার ফৌজ ক্রমেই হঠতে লাগল।  
 সন্ধ্যা প্রায় হয়, বাইশটা অস্তরের ধা খেয়ে মহারানা দুর্বল হয়ে পড়েছেন,  
 সুরজমলের সৈন্যরা নদীর এপারটাও দখল করেছে, বিদ্রোহীদের আর  
 ঠেকিয়ে রাখা চলে না, এমন সময় এক হাজার রাজপুত নিয়ে পৃথ্বীরাজ  
 এসে পড়লেন; যুদ্ধ সেদিনের মতো স্থগিত রইল। দুই দলেই লড়াই  
 বন্ধ রেখে যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছে, মাঠের দিকে দিকে মশাল  
 আর ধুনি জ্বলছে; সারাদিনের পর সুরজমল অনেকগুলো অস্ত্রের চোট  
 খেয়ে নাপিত ডেকে কাটা ঘা-গুলো ধুয়ে পুঁছে পটি-বেঁধে একটু বিশ্রামের  
 চেষ্টায় আছেন, এমন সময় হঠাৎ সামনে পৃথ্বীরাজকে দেখে সুরজমল  
 খাটিয়া ছেড়ে এমন বেগে দাঁড়িয়ে উঠলেন যে, তাঁর বুকে বাঁধা কাপড়ের  
 পটিটা ছিঁড়ে ঘা দিয়ে রক্ত ছুটল। পৃথ্বীরাজ তাড়াতাড়ি খুড়োকে ধরে  
 খাটিয়াতে শুইয়ে দিয়ে বললেন, “ভয় নেই; কেমন আছ তাই জানতে  
 এলেম।” সুরজমল একটু হেসে বললেন, “হঠাৎ তুমি এসে পড়ায় একটু  
 ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেম! যা হোক, অনেক দিন পরে তোমাকে দেখে  
 খুসি হলেম। মহারানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করনি?” পৃথ্বীরাজও হেসে বললেন,  
 “কমলমীরে তোমার খবর পেয়েই ছুটে আসছি, বাবার সঙ্গে এখনো  
 দেখা হয়নি।” এই সময় এক দাসী সোনার থালায় খাবার নিয়ে হাজির  
 হল। সুরজমল বললেন, “আরে দেখচিস্নে কে এসেছে! যা দৌড়ে  
 আর এক থালা নিয়ে আয়।” দাসী এদিক-ওদিক চাইছে দেখে সুরজমল  
 বললেন, “বুঝেছি সারংদেব এই একথাল। বই আর কিছু পাঠায়নি;  
 খুড়ো-ভাইপোতে আজ এক থালেই খাব।” শুনেই পৃথ্বীরাজ একটা  
 মিষ্টি তুলে মুখে দিলেন। দিনের বেলায় শক্রতা গল্প-হাসি খাওয়া-দাওয়ার

চোটে কোথায় পালিয়ে গেল ! বিদায়ের সময় পৃথীরাজ খুড়োকে বললেন, “আমাদের পুরানো ঝগড়াটা তাহলে আজ তোলা থাক, কাল সকালেই শেষ করা যাবে, কি বল ?” সুরজমল হেসে বললেন, “বেশ, আজকের মতো একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক ! কিন্তু কাল খুব সকালেই আমি তৈরী থাকব জেন ।”

তার পরদিনের লড়াইয়ে বিদ্রোহীদের পৃথীরাজ হারিয়ে দিলেন । সুরজমল সারংদেবকে নিয়ে পালিয়ে চললেন । পৃথীরাজও তাদের পিছনে তাড়িয়ে চললেন—একটার পরে একটা পরগণা বিদ্রোহীদের হাত থেকে আবার জয় করতে-করতে । শেষে সুরজমলের একটু দাঁড়াবারও স্থান রইল না । সারংদেবের রাজ্যটা পর্যন্ত পৃথীরাজ দখল ক’রে নিলেন । ছুই বিদ্রোহী তখন স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে নিমচ-এর জঙ্গলে বড়-বড় গাছের গুঁড়ি আর ডালপালা দিয়ে খুব মজবুত-রকম বরোজ বানিয়ে তার মধ্যে লুকিয়ে রইল । একদিন সুরজমল নিশ্চিন্ত মনে বসে গল্পগুজব করছেন—ছপুর-বেলা বাইরে বনের মধ্যেটা গুঁশান্, কোনখানে ঘন পাতার আড়ালে বসে ছুটো নীল পায়রা কেবলি বকম্-বকম্ করছে—এমন সময় বাঘ যেমন চুপিসাড়ে এসে হঠাৎ শিকারের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি পৃথীরাজ ঘরের বেড়া ডিঙিয়ে একেবারে সুরজমলকে চেপে ধরলেন । ছুজনে ধস্তাধস্তি চলল । পৃথীরাজ খুড়োকে কাবু করেছেন এমন সময় সারংদেব ছুজনের মাঝে পড়ে পৃথীরাজকে ঠাণ্ডা ক’রে বললেন. “কর কি ! দেখছ না তোমার খুড়োর অবস্থা ? কি রকম কাহিল, এক চড়ে উলুটে পড়েন ! দাও, ছেড়ে দাও বেচারাকে !” সারংদেবের মোড়লি সুরজমলের মোটেই ভালো লাগল না, তিনি বুক ফুলিয়ে বললেন, “দেখ সারংদেব, যে চাপড়টার কথা বললে সে চাপড়টা এখন আমার এই ভাইপোর হাত থেকে এলে আমি কাবু হব বটে কিন্তু তোমার কার হাত থেকে এলে এই কাহিল শরীরও শক্ত হয়ে দাঁড়াবে, আর এক চাপড়ের বদলে তোমার

নাকে দশটা ঘুসি বসিয়ে দেবে নিশ্চয়ই। সরে দাঁড়াও, লড়তে হয় আমরা খুড়ো-ভাইপোতে লড়ব ; মিটমাট করতে হয় তো আমরাই করব— বুঝেচ ?” সুরজমলের তেজ দেখে পৃথীরাজ অবাক হলেন, সারংদেব রেগে কটমট ক’রে চাইতে-চাইতে বেরিয়ে গেল। ঝনাৎ-ক’রে সুরজমল নিজের তলোয়ার খাঁপে বন্ধ ক’রে বললেন, “দেখ পৃথীরাজ, তোমাতে-আমাতে লড়াই এতে আমি যদি মরি তোমার হাতে, তাতে কোনো দুঃখও নেই, কৃতিও নেই—ছেলেছোটো আমার উপযুক্ত হয়েছে, কিছু না জোটে তো মহারানার ফৌজে গিয়ে ভর্তি হবে, তবু তোমাদের বিরুদ্ধে আমার মতো তারা অস্ত্র ধরবে না। কিন্তু তুমি যদি আমার হাতে মর তবে শুধু যে আমার লজ্জার উপর লজ্জা, দুঃখর উপর দুঃখ পেতে হবে. তা নয় ; দাদার পরে তুমি না থাকলে চিতোরের দশাটা কি হবে ভেবেছ কি ? আমি লড়ব না। ইচ্ছা হয় তুমি আমাকে মেরে ফেল, কিন্তু বন্দী ক’রে যে আমায় নিয়ে যাবে তা হবে না।” সুরজমল যে চিতোরের সঙ্গে প্রাণে-প্রাণে এক, তা বুঝতে পৃথীরাজের দেরী হল না। তলোয়ার বন্ধ ক’রে তিনি খুড়োকে প্রণাম করলেন। সুরজমল ভাইপোকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, “এতদিনে আমার অদৃষ্টের লিখন একটু ফলল— তোমার হৃদয়-সিংহাসনের খুব কাছে আমি এলুম ; এখন বাকি শুধু যে মাটিতে জন্মেছি সেই মাটির একটুকরোতে মাথা রেখে মরার ব্যবস্থা করে নেওয়া।” পৃথীরাজ খুড়োর পাশে বসে সেই আগেকার মতো আবার হাসিমুখে শুধোলেন, “আমি আসবার আগে তুমি কি করছিলে খুড়ো ?” “ছেলেদের রাজস্থানের ইতিহাস আর গল্প শুনিয়ে খানিক বাজে সময় কাটাচ্ছিলেম”—ব’লেই খুড়ো হাসলেন।

পৃথীরাজ অবাক হয়ে বলবেন, “আমি তাড়া ক’রে আসতে পারি জেনেও সে জন্তে সতর্ক না থেকে বেশ আরামে শুয়ে গল্প করছিলে ?”

সুরজমল হেসে বললেন, “লড়াই করা কি পালান—এ-ছোটোই করবার

পাথ ভূমি বন্ধ করেছে, কাজেই ছেলের নিয়ে খোঁসগল্প ক'রে সময় কাটান ছাড়া করবার আর কি আছে বল ?”

পৃথীরাজ শুনে বললেন, “কেন, আমার সঙ্গে বাবার কাছে গিয়ে মাথা-গোঁজবার জায়গাটা ক'রে নেবার চেষ্টা করনা কেন !”

সুরজমল খানিক গম্ভীর হয়ে বললেন, “আগে হলে যেতেম কিন্তু এই বিদ্রোহের পরে মাথা-গোঁজবার জায়গা চিতোরের বাইরে ক'রে নেওয়াই ঠিক ; আর তা হলেই ধড় এবং মাথা—ছোটো নিয়ে কিছুদিন আরাম করা যেতে পারবে ।”

পৃথীরাজ খানিক ভেবে বললেন, “তা যেন হল, কিন্তু মহারানাকে একটা মাথা না হাজির ক'রে দিতে পারলে আমার যে মাথা হেঁট হবে, কাটাও যাবে—তার কি বল !”

সুরজমল পৃথীরাজের কানে-কানে বললেন, “সারংদেবের মাথাটা যদি কাজে লাগে তো নিয়ে যাও । ওর মাথার সঙ্গে ওর রাজ্যটাও হাতে আসবে, আমার মাথার সঙ্গে এই ছেঁড়া পাগড়িটা ছাড়া আর তো কিছুই পাচ্ছনা । বেশী সুখ্যাতি পাবে ওই মাথাটা নিলে !”

পৃথীরাজ প্রস্তুত হয়ে উঠলেন, কিন্তু বরোজের মধ্যে সারংদেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না । তিনি চোখ-রাঙিয়ে খুঁড়োকে বললেন, “আমাকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছ ”

সুরজমল খানিক ভেবে বললেন, “এস আমার সঙ্গে বাইরে, বড় মাথা না পাও, ছোট মাথাই নিও ।” বনের মধ্যে খানিক এগিয়ে গিয়ে

সুরজমল একটা ভাঙা মন্দির দেখিয়ে বললেন, “দেখছ মন্দিরটা, ওখানে একসময় নরবলি হত । বছদিন বলি বন্ধ হয়ে গেছে, দেবীও মানুষের কাঁচা মাথা অনেক কাল পূজো পাননি, ওইখানে সারংদেব আমাকে পূজো করতে যেতে আজ ডেকে গেছে, কিন্তু আমার হয়ে ওখানে যেতে তোমার সাহস হবে কি ?” “খুব হবে !”—বলেই পৃথীরাজ সুরজ-

মলকে নিজের পাগড়ি দিয়ে কলে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে মন্দিরে গিয়ে  
 ঢুকলেন। বেশী দেবী হল না, সারংদেবের কাঁচা মাথাটা কেটে নিয়ে  
 খুড়োর বাধন খুলে দিয়ে পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ বন্ধ ক'রে চিত্তোরে চলে গেলেন।  
 যে-সব পরগনা জয় করতে-করতে সুরজমল ফৌজের পায়ের তলায়  
 প্রজার সুখ-শান্তি চূর্ণ ক'রে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেদিন,  
 সেই নারি, বাটেরা, নিমচ-এর রাস্তা ধরেই হেরে ফিরতে হল—তাকে  
 ঘাড় হেঁট ক'রে। তিনটে বড় বড় রাজত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে  
 গেল, রইল কেবল একটুখানি সদ্দিপরগনা। কিন্তু সেটুকুও বেশী-  
 দিন থাকবে কি না সুরজমল ভাবছেন—এমন সময় একদিন দেখলেন  
 গায়ের ধারে মন্দিরের সামনে একটা ডালকুত্তো ছোট একটা ছাগলছানা  
 শিকার করবার চেষ্টা করতেই একটা রামছাগল তাকে চু মেরে তাড়িয়ে  
 ছানাটা স্কন্ধ মন্দিরে গিয়ে সঁধাল। কুকুরটা মন্দিরের সামনে ঘেউ ঘেউ  
 ক'রে চোঁচাতে লাগল—কিন্তু ভিতরে ঢোকবার সাহস করলে না।  
 সুরজমল ঠিক করলে এইখানেই নিরাপদে থাকা যাবে—এই মন্দির  
 হবে আমার ঘর, কেলা, সমস্তই। সেইদিন সুরজমল সদ্দি থেকে কারিগর  
 ডাকিয়ে সেই মন্দির ঘিরে ছোট এক কেলা তুললেন, তার চারিদিকে  
 বাজার হাট বসালেন; সব-শেষে 'দেওলা'-গ্রাম মায় সমস্ত সদ্দিপরগনা  
 আর কন্থল পাহাড়ের উপরে তাঁর কেলাটি পর্যন্ত দেবতার নামে উৎসর্গ  
 ক'রে সুমন্তটার নাম রাখলেন দেউলগড়। দেবতার কেলা, তার উপর  
 চড়াও হতে রানারও সাধ্য নেই, বাট হাজার বছর নরকের ভয় আছে!  
 সব রাজার রাজ্যের সীমানার বাইরে এই দেউলগড়ে, সুরজমল নির্ভয়ে  
 রইলেন, নিশ্চিত হয়ে মরবার সময় পেলেন; তাঁর কপালের লিখন এমনি  
 ক'রে ফলুল।

জয়মল, সুরজমল, দুজনেই চিত্তোরের সিংহাসন আর পৃথ্বীরাজের মাঝ  
 থেকে সরে পড়লেন; রইলেন কেবল সঙ্গ। একদিন কমলমীরে পৃথ্বীরাজের

সকল এসে খবর দিলে—সকল বেঁচে আছেন ; শ্রীনগরের রাজার মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের উদ্যোগ হচ্ছে । পৃথীরাজ তখন নিজের দলবল নিয়ে সকলকে জ্বালে বাঁধার পরামর্শ করতে বসলেন ; কিন্তু পৃথীরাজের অদৃষ্টও বসে ছিল না, সে দিনে-রাতে আলোতে-অন্ধকারে স্মৃথে-দুখে মিলিয়ে যে বেড়াজাল পৃথীরাজকে ধরবার জন্তে বুনে চলেছিল, এতদিনে সেটা শেষ হল । সকালে পৃথীরাজ সোজা-সোজা সকলকে ধরবার জন্তে বার ছবেন, এমন সময় শিরোহি থেকে পৃথীরাজের ছোটবোন এক পত্র পাঠালেন । সে অনেক দুঃখের কাহিনী । বিয়ে হয়ে অবধি তাঁর স্বামী তাঁকে অপমান করছে, লাধি মারছে, ঘরের বার ক’রে দিতে চাইছে । সে নেশাখোর, দুষ্ট এবং একেবারে নির্দয় । বাবা বুড়ো হয়েছেন, এখন দাদা এসে এই অপমানের প্রতিশোধ না দিলে তাঁর ছোটবোন মারা যাবে । ছোটবোনের কাশ্মা-ভরা সেই চিঠি পড়ে, পৃথীরাজ চলেছিলেন শ্রীনগরের বাইরের দিকে তলোয়ার উঁচিয়ে—কিন্তু যাওয়া হল না, পৃথীরাজের ঘোড়া ফিরল শিরোহির মুখে—বোনকে রক্ষা করতে । অদৃষ্ট টেনে নিয়ে চলল পৃথীরাজকে সজ্জের দিক থেকে ঠিক উলটে মুখে—অনেক দূরে ।

রাতের অন্ধকারে শয়নঘরের মেঝেয় পড়ে রানার মেয়ে কেবলই চোখের জল ফেলেছেন, রানার দেওয়া সোনার খাটে শিরোহির রাজা ভরপুর নেশায় নাক ডাকিয়ে ঘুমচ্ছে, হঠাৎ সেই সময় পৃথীরাজ ঘরে ঢুকে এক লাধিতে শিরোহির রাজাটাকে ভূঁয়ে ফেলে দাড়ি চেপে ধরলেন । রানার মেয়ে পৃথীরাজের তলোয়ার চেপে ধরে বললেন, “দাদা থাম, প্রাণে মের না ।” পৃথীরাজ রেগে বললেন, “এত বড় ওর সাহস, তোর গায়ে হাত তোলে । জানেনা তুই মহারানার মেয়ে । ওকে কুকুরের মতো চাবুক মেরে সিধে করতে হয় ।” শিরোহির তখন নেশা ছুটে গেছে, সে পৃথীরাজের পা জড়িয়ে বললে, “এমন কাজ আর হবে না, কমা

কর। পৃথ্বীরাজ তার বাড়ি ধরে লাড়ু করিয়ে বললেন, “নে, আমায় বোনের জুতোজোড়া মাথায় করে ওর কাছে কমা চা—তবে রকে পাবি।” “একথা আগে বললেই হত।” বলে তাড়াতাড়ি জুতোজোড়া তুলে নেয় দেখে রানী বললেন, “থাক এবার এই পর্যন্ত। যাও এখন দাদাকে জলটল খাইয়ে ঠাণ্ডা করগে, আমায় একটু ঘুমতে দাও।” রানার জামাই খুব খাতির করে পৃথ্বীরাজকে বাইরে নিয়ে বসিয়ে সোনার রেকাবিতে শিরোহির খাসা লাড়ু গুটিকতক জল-খেতে দিলেন। শিরোহির খাসা-লাড়ু—অমন লাড়ু কোথাও হয় না, পৃথ্বীরাজ তাই গোটা চার-পাঁচ মুখে ফেলে এক ঘটি জল খেয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে কমলমীরে আপনার দলবলের সঙ্গে মিলতে চললেন। কমলমীরে আর তাঁর পৌছতে হল না; শিরোহির মতিচূর সৈকোবিষ আর হীরেচূরে যেখে তাঁর ভগিনীপতি খেতে দিয়েছিল—জুতো-তোলার শোধ নিতে।

তখন রাত কেটে সবে সকাল হচ্ছে, দূর থেকে কমলমীর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সেই সময় পৃথ্বীরাজ ঘোড়া থেকে ঘুরে পড়লেন—রাস্তায় ধুলোয়। কমলমীর—যেখানে তাঁর তারারানী একা রয়েছেন, সেইদিকে চেয়ে তাঁর প্রাণ হঠাৎ বেরিয়ে গেল—দূরে—দূরে—কতদূরে—সকালের আগুনবরন আলোর মাঝে নীল আকাশের শুকতারার অস্তপথ ধরে। আর ঠিক সেই সময় সন্দের অদৃষ্ট শ্রীনগরের নহবৎখানায় বসে আশা-রাগিনীর স্বর বাজিয়ে দিলে—“ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি।”





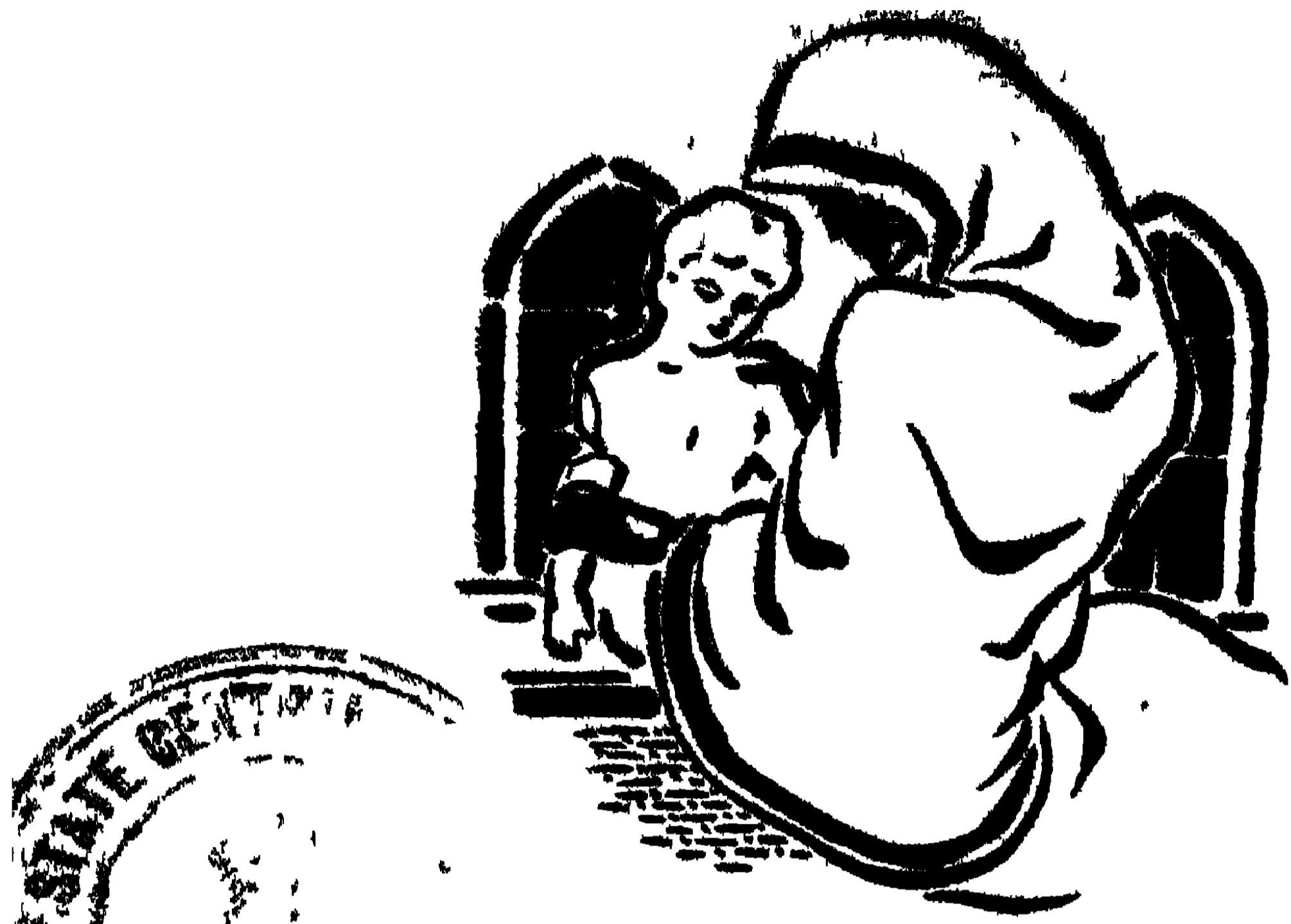




# আপন কথা

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

“এই খাতাটা অনেকদিন কাছে-কাছে রয়েছে, ভাব হয়ে গেলো এটার সঙ্গে। ভাব হলো যে-মানুষের সঙ্গে কেবল তাকেই বলা চললো নিজের কথা সুখ-দুঃখের। আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে—তাদেরই দিলেম এই লেখা-পাতা। আর যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবন-ভাব সুখ দুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেবাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায়, তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি। যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যাবা কাছে এসে বলে ‘গল্প বলো’, সেই শিশুজগতের সত্যিকার রাজা-দানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্তু আমার এই লেখা-পাতা ক’খানা। তাদেরই আদাব দিয়ে বলি, গরীব পববৎ সেলামৎ, অব আগাজ্জ কিস্‌সেকা করতা হ্, জেরা কান দিয়ে কব শুনো!” অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কাহিনী, ঠাকুর-বাড়ি ও অবনীন্দ্রনাথের বহু অপ্রকাশিত ছবি, অভিনব গঠনসজ্জা। দাম ৫



## ক্ষীরের পুতুল

ছোটোদের জন্ম তৈরী আজকালকার খেলো রহস্য-রোমাঞ্চের মাঝে অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' যেন ব্যরঝুরে বালির মাঝে চিক্চিকে জল। আগাছা জঙ্গলের মাঝে বিশল্যকরণী। অধম লেখা পড়ে পড়ে ছোটোদের কল্পনা গেছে মরে, স্বাদ গিয়েছে বিগড়ে। মরা-ঝরা দেশে অবনীন্দ্রনাথ সোনার কাঠি হাতে নিয়ে এসেছেন, মুহূর্তে মৃত-শাখায় জাগছে কিশলয়। ছেলেরা ফের ফিরে পাচ্ছে তাদের ভাষা, স্বাস্থ্য ও লাভণ্য। অমূল্য বই-এর ছর্মূল্য ছবি। ১৫০ দাম কিন্তু মনে হবে সাত জাহাজ সোনা কিনে বাড়ি ফিরলার









